জীলানী. জান শরীফ বাবা দেলোয়ার হোসেন আল-সুরেশ্বরী • সেই-সত্ত্বা

জীলানী. জান শরীফ
বাবা দেলোয়ার হোসেন আল-সুরেশ্বরী

সেই সত্ত্বা

জীলানী, জান শরীফ
বাবা দেলোয়ার হোসেন আল-সুরেশ্বরী
সেই সত্ত্বা
প্রকাশনায়
সন্ধান লুঙ্গী
কুলনিয়া, দোগাছী, পাবনা।

সেই সত্ত্বা – ০২

প্রকাশক : দরবার শরীফ
পক্ষে- মোঃ আক্তারুজ্জামান (বাবু)
মোবাইল ঃ ০১৭১৬-৫১০০৫৯

স্বত্ব : মুক্ত

প্রকাশকাল : আগস্ট ২০২০ইং

প্রথম প্রকাশ

প্রচ্ছদ : সুজন

বর্ণবিন্যাস : সুজন

মুদ্রণ : মমিন অফসেট প্রেস, রাজা হাজী মার্কেট, পাবনা।

মূল্য : ১৬০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান ঃ

জীলানী. জান শরীফ
বাবা দেলোয়ার হোসেন আল-সুরেশ্বরী
কায়েমকোলা, দোগাছী, পাবনা।
Web: www.babadeloyer.com
YouTube Baba Deloyer

সেই সত্ত্বা – ০৩

“একটি বিপদজনক ব্যক্তি কেন্দ্রিক গবেষণা মূলক পুস্তক”

সেই সত্ত্বা – ০৪

-ঃ উৎসর্গ ঃ-

সুফিবাদের আলোর উজ্জ্বল নক্ষত্র এবং একজন ঝানু সৈনিক, কবি ও লেখক। যাকে আমার প্রাণ প্রিয় মোর্শেদ চেরাগে জান শরীফ ডাঃ কালান্দার বাবা জাহাঙ্গীর বা-ঈমান আল-সুরেশ্বরী নিজ থেকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। বাবা উনাকে সৈয়দ বলে সম্মোধন করতেন, তিঁনি আমার আপন গুরুঘরের অধিবাসী (গুরুভাই)। শাহ সুফি জনাব সৈয়দ তারিক আল-সুরেশ্বরীর পবিত্র হস্ত মোবারকে বইটি উৎসর্গ করিলাম।

একটি ঘোষনা

যে কেহ এই বইটি ছাপাইয়া যে কোন দামে বিক্রিত অথবা প্রচার করিতে পারিবেন। ইহাতে লেখক ও প্রকাশকের পক্ষ হইতে কোন প্রকার আপত্তি রহিল না এবং থাকিবে না। কারণ এই বইটির মালিকানা লেখক নিজ হইতে সজ্ঞানে সমগ্র পৃথিবীর যে কোন দেশের জাতী সত্ত্বার অনুসারীদেরকে সমানভাবে অধিকার দিবার প্রকাশ্য ঘোষণা করিয়া গেলেন। তা ছাড়া দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক এবং যে কোন সাময়িকীতে এই বই এর সম্পূর্ণ অথবা আংশিক লেখকের নামে অথবা যে কোন কারো নামে ধারাবাহিক ভাবে ছাপাইতে পারিবেন। এতে লেখকের বা প্রকাশকের কোন প্রকার আপত্তি থাকিবে না। যদি কেহ কোন দিন বইটির মালিকানার মিথ্যা দাবি তোলেন তাহা হইলে সেই মিথ্যা দাবি সর্বস্থানে, সর্ব আদালতে বাতিল বলিয়া গন্য হইবে। আরো উল্লেখ থাকে যে, এই বইটি পৃথিবীর যে কোন দেশের যে কোন ভাষায় অনুবাদ করিয়া ছাপাইতে পরিবেন।

সূচীপত্র

	আলোচ্য সূচী	পৃষ্ঠা নং
১।	একত্ত্ববাদের বিষয়ে কিছু কথা	৭
২।	হায়াতে ডাঃ বাবা জাহাঙ্গীর বা-ঈমান আল-সুরেশ্বরী	৭২
৩।	চূড়ান্ত স্থায়ীত্ত্বের ভাবধারা নিয়ে আলোচনা	৮০
৪।	সৃষ্টির সূচনা সম্পর্কে আলোচনা	৯৫

একত্ত্ববাদের বিষয়ে কিছু কথা

সুরা ইখলাসের আলোকে

বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম।
অর্থঃ- আল্লাহ্‌র নামে শুরু আর-রহ্‌মান (যিনি দয়াল দাতা)
এবং আর-রহিম (যিনি দয়ালু)।

➔ **কূলহু আল্লাহু আহাদ।**
অর্থঃ- বলো আল্লাহ্‌ একক।

➔ **আল্লাহুস সামাদ।**
অর্থঃ- তিঁনি মহা নিরপেক্ষ।

➔ **লাম ইয়ালিদ, ওয়ালাম ইউলাদ।**
অর্থঃ- তাঁকে কেউ জন্ম দেয় নি,
তিঁনিও কারো কাছ থেকে জন্ম নেন নি।

➔ **ওয়া লাম ইয়া কুলাহু কুফুওয়ান আহাদ।**
অর্থঃ- তাঁর (আহাদের) সমতুল্য কেউ না।
অর্থাৎ তিঁনি (আহাদ) কারো মুখাপেক্ষী না।

(সূরা ইখলাস)
(অর্থঃ- একত্ত্ববাদ)

জাগতিক ভাবে এই কালাম পাক সুরা ইখলাস ছোট একটি সুরা। এই সুরাটি আল্লাহ্‌র একত্ত্ববাদের শান-মান, জালুয়া বহন করে। এ বিষয়টা নিয়ে আমরা একটু বুঝতে চেষ্টা করব। শুরুতেই যে আলোচনাটুকু রাখব সেটা একটু

নিম্নে সে বিষয়ে সংক্ষেপে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব, সেটা হলঃ-

আমরা যে বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম বলি বা পড়ি, এটার অর্থ করা হয় হলোঃ- আল্লাহ্‌র নামে শুরু করিলাম।

সেই সত্ত্বা – ০৮

এই আয়াতের জাগতিক শাব্দিক অর্থ এবং আমরা যারা সুফি মতাদর্শের বা আধ্যাত্মবাদের আলোকে বিষয়গুলো একটু ভাববাদীতে বুঝতে যাই, যার কারণে অর্থের বিন্যাসটুকু শ্রুতি মাধূর্য্য না হলেও বিষয় গুলো একটু পরিস্কার ভাবে বুঝতে চেষ্টা করি।

বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। অর্থঃ- আল্লাহ্‌র নামে শুরু, আর-রহ্‌মান (যিনি দয়াল দাতা) এবং আর-রহিম (যিনি দয়ালু) নামে শুরু করিলাম।

এখানে একটু খেয়াল করবার বিষয় এই যে, আয়াতে কালামে তিনটি বিশেষণ উপস্থিত রয়েছে আর সেগুলো হলোঃ- বিস্‌মিল্লাহির অর্থ আল্লাহ্‌র নামে শুরু, আর-রহ্‌মান অর্থ যিনি দয়ালদাতা এবং আর-রহিম অর্থ যিনি দয়ালু। তাহলে আমরা এখন বুঝতে পারলাম এই আয়াতে কালামে আল্লাহ্‌র দুইটি নাম সংযোজন করা রয়েছে। একটি হলো, আর-রহ্‌মান এবং অপরটি আর-রহিম। এখন এই আর-রহ্‌মান এবং আর-রহিম আল্লাহ্‌র এই দুইটি নামের বিশেষণ সম্পর্কে আমাদের সম্মক জ্ঞান না থাকলে বিস্‌মিল্লাহর কার্যকারিতা সম্পর্কে উপলব্ধি হয় না। এজন্য আমরা শুধু মুখস্থ বিদ্যায় পড়ে গেলাম এর ভাব অর্থ এবং কার্যকারিতার দিকে নিজেদেরকে নিয়োজিত করলাম না।

তাহলে এই নিয়োজিত ব্যবস্থাটা কি একটু বুঝতে হবে। কারণ আর-রহ্‌মান শব্দের অর্থ করা হয় হলো যিনি দয়াল দাতা এবং আর-রহিম শব্দের অর্থ করা হয় হলো যিনি দয়ালু। তাহলে দয়াল দাতা এবং দয়ালু এই দুইটা শব্দের মধ্যে পার্থক্য কি ? এই শব্দের উচ্চারণ গুলো, এর বিভাজন গুলো মানুষের দোরগোঁড়ায় না পৌঁছে এক বাক্যে বলে দেওয়া হলোঃ- আল্লাহ্‌র নামে শুরু করিলাম। বুঝতে পারছেন তো, জাগতিক এর সাথে আধ্যাত্মবাদের একটি তফাৎ কোথা থেকে শুরু হয়! প্রতিটি স্তরে এভাবে বিভেদ বিভাজন বা আবরণকৃত ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে ধর্মীয় দর্শন দাঁড়িয়ে আছে। এই আবরণের পর্দা যদি আপনি সরিয়ে দিতে পারেন, তাহলে মূল ধারার বিষয় সম্পর্কে অবগত হতে পারবেন। আর যদি আবরণের পর্দা ঢাকনা দিয়ে আবদ্ধ হয়ে থাকে, তাহলে মূল বিষয় সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হবে না বা কার্যকারিতা পাবে না।

তাহলে আয়াতে কালামে প্রথমে আল্লাহ্‌র নামে শুরু, এর পরেই আসছে আর-রহ্‌মান। সুরা আর-রহ্‌মান নামে একটি সুরা আল্লাহ্‌ কালামপাকে নাযিল করেছেন, এই আর-রহ্‌মান অর্থ যিনি দয়ালদাতা। এই আর-রহ্‌মানের গুণাবলী বা কার্য্যাবলী কেমন সেই বিষয়ে আপনাদের আগে একটু জানিয়ে দেই। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র থেকে শুরু করে সৃষ্টি রাজ্যের ফলমূল, বৃক্ষ-তরুলতা, জীবজন্তু সকল কিছুর বর্ণনা এই সুরা আর-রহ্‌মানে তুলে ধরা হয়েছে। আর এটা হলো দয়াল দাতার অবিনশ্বর বা যাকে আমরা একক বলি বা ইনফিনিট বলি। অর্থাৎ গোটা দুনিয়াতে আল্লাহ্‌পাকের যত নেয়ামত বা বৈশিষ্ট সকল কিছু বান্দার জন্য।

আর-রহ্‌মানের অর্থ একটু ব্যাখ্যা করে বলছি। দুনিয়ার জিন্দিগিতে অনেক মানুষ আছে যারা আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করে না, যাদেরকে নাস্তিক বলা হয়। তাহলে এই মানুষ গুলোর খাওয়া-পরা থেকে শুরু করে যত কিছু বিশেষণ সমস্ত কিছুর যোগান তো আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই হয়। সে মুখে ঠিকই প্রকাশ করে যে আমি আল্লাহ্‌কে মানি না অথচ তার রিযিক আল্লাহ্‌পাক বন্ধ করেন না। সে ঠিকিই খেতে পায়,পরতে পায়। তাদেরকে আল্লাহ্‌ কিন্তু কখনও তাঁর নেয়ামত থেকে বঞ্চিত করেন না। কারণ বান্দা দুনিয়াতে আসার বহু পূর্বেই তার তকদির নির্ধারিত। ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) বলেছেন যে:- আপনার জন্য যা নির্ধারণ করা হয়েছে তা যদি দুই পর্বতের নীচেও থাকে তা আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। যা আপনার জন্য নির্ধারণ করা হয় নি, তা যদি আপনার দুই ঠোঁটের মাঝেও থাকে তবুও তা আপনার কাছে পৌঁছাবে না। সে কি করবে ? কিভাবে খাবে ? কিভাবে পরিচালিত হবে ইত্যাদি। সকল কিছু বান্দা পৃথিবীতে আবির্ভাবের পূর্বেই এটা তার জন্য প্রস্তুত থাকে বা রেডি করা থাকে। এই রেডি হলো রহ্‌মানের দান। মানে রহ্‌মান যে দান করে, সেই দানকে কখনই তুলে নেওয়া বা ছিনিয়ে নেওয়া হয় না। বান্দা পৃথিবীতে আবির্ভাবের পর বা জন্ম লাভের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মাঝামাঝি যে সময়টা, এই সময়ের মধ্যে এটা নির্দিষ্ট করে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে তার ভাগ্যলিপি বা তকদিরে সে যেটা পাবে, সেটা আল্লাহ্‌ দিয়ে দেন। অর্থাৎ এই দানকে কখনই বান্দার তকদির থেকে আল্লাহ্‌ কর্তন করেন না। তাহলে এই রহ্‌মানের যে বিশেষণ বা দান এটা হলো অবধারিত।

সেই সত্ত্বা – ১০

তাই সুরা আর-রহমানের মধ্যে আল্লাহ্পাক বার বার বলেছেন যে:- ফাবিআইয়ি আলায়ি রাব্বি কুমা তুকাজ্জিবান অর্থ:- তুমি আল্লাহ্র কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে ? তাহলে এই নিয়ামত আমাদের উপর অবধারিত ভাবে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ রহ্মানের বিশেষ যে দান, সেই দানকৃত ব্যবস্থায় এগুলো দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এটা আর ফেরৎ নেওয়া হয় না। তাহলে এই যে দান, এই দানের বিশেষণটাই হলো রহ্মানের দান। অর্থাৎ রহ্মানের দান যা পূর্বেই দিয়ে দিয়েছেন, যা আর ফেরৎ নেওয়া হবে না। কতটুকু সময় ? এই জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এই সময়ের মধ্যে সে যা প্রাপ্ত, তার জন্য সেটা বরাদ্দ হয়ে গেছে। এই দানকে সার্বজনীন বলা হয়। অর্থাৎ রহ্মানের যে দান সেই দান থেকে আল্লাহ্পাক কখনই কাউকে বঞ্চিত করেন না।

এজন্য তাকে বলা হয় হলো দয়াল দাতা। অর্থাৎ আল্লাহ্পাকের এটা এমন এক ধরনের দান, যার বৈশিষ্ট হলো কখনই সেই দান থেকে কাউকে বঞ্চিত করা হয় না। সেই দানকারীর যে অবয়ব বা খেতাব, সেই খেতাবি নামটাই হলো রহ্মান। এই রহ্মানের দান এভাবে রাখা হয়েছে। তাহলে এই আর-রহ্মান হলো ঐ সকল দানের মূল উৎস।

তাই সুরা আর-রহ্মানের মধ্যে আল্লাহ্পাক বার বার বলেছেন যে:- ফাবিআইয়ি আলায়ি রাব্বি কুমা তুকাজ্জিবান অর্থ:- তুমি আল্লাহ্র কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে ? আল্লাহ্পাক কোরানে এভাবে কেন বললেন ? এর অর্থ কী ? এটারও তো একটি কারণ রয়েছে, শুধু শুধু তো আমাদেরকে এই সকল নেয়ামতকে দেওয়া হয় নি। এর অর্থ হলো:- আল্লাহ্পাক মানুষকে সৃষ্টির সেরা ঘোষণা করেছেন। অর্থাৎ আশরাফুল মাখলুক। এই মানব কূলে আবির্ভাবের পর থেকে তার কার্যক্রম হবে আল্লাহ্র সান্নিধ্যের বিকাশ নিয়ে চিন্তা করা। আল্লাহ্র প্রেমময়ীতার সঙ্গে নিজেকে নিয়োজিত করা। অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ্কে প্রাপ্তির যে লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য, সেটারই বাস্তবায়ন বান্দা দুনিয়াতে এসে করবে। এই কারণে রহ্মানের দানটা এরকম ভাবে রাখা হয়েছে। এই পৃথিবীতে ৮৪ লক্ষ প্রাণীর বাস। মানুষই শুধু রোজগার করে বাকী প্রাণীরা কিন্তু অনাহারে মরে না। বেশির ভাগ মানুষই রিজিকের পিছনে দৌঁড়ায় কিন্তু রিযিক দাতার দিকে মানুষ যেতে চায় না।

তাহলে রহ্মানের যে দান সেই দানটুকু আমরা ভক্ষণ বা ব্যবহার করবার পর, আমরা অধিকাংশই স্রষ্টার প্রেমময়ীতার মুখ থেকে ডাইভার্ড বা দুরিভূত হয়ে

যাই। এই মানব যখনই এভাবে দুরিভূত হয়, তখনই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রতিনিধি আসেন। তাঁরা স্রষ্টার সুশিক্ষার আলোকে মানুষকে আবার আল্লাহ্‌র প্রেমময়ীতার দিকে ফেরানোর জন্য সেই তালকিন বা মোরাকাবা মোশাহেদার মাধ্যমে তাঁর প্রেমময়ীতাতে লীন করবার প্রেক্ষাপট গুলোই বুঝিয়ে থাকেন। যারা আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি হন, তাদের কার্য্যক্রম এরকম স্রষ্টার সান্নিধ্যের বিকাশময় ধারাতে পরিচালিত করেন। তাহলে বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম, এই আয়াতের শেষ বিশেষণ হলো আর-রহিম। এই রহিম নামে যত প্যাঁচ। প্যাঁচ কেন ? আসলে এই রহিমের যে দান, সেই দানটুকু হলো:- আল্লাহ্‌পাক যদি কোন বান্দাকে ক্ষমা করে দেয় এবং এই ক্ষমা করবার পর বান্দা যদি মওলার সান্নিধ্য গ্রহন করে তাহলে তখনই তাঁর নাম হয় রহিম। সেটাই হলো রহিমের দান এবং তখনই আল্লাহ্‌পাকের নাম হয় হলো রহিম। এই রহিম নামের যে দান, এই দানটি সবাই পাবে না। সমগ্র কোরানুল মাজিদে যদি তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেন, তাহলে কোথাও গাফুরুর রহ্‌মান পাবেন না। কোরানের কোথাও গাফুরুর রহ্‌মান নেই, আছে হলো গাফুরুর রহিম। অর্থাৎ ক্ষমার পরের একটি বিশেষ অবয়বের দান হলো এই রহিম। অর্থাৎ বান্দা যখনই অনুশীলনগামী ব্যবস্থার মাধ্যম দিয়ে বা বান্দা তার কৃত কর্মের আমলের দ্বারা বা তার মোরাকাবা মোশাহেদার দ্বারা তরান্বিত করতে করতে একটি পর্যায়ে গিয়ে সাধক আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট লাভ করতে পারে। সাধক যখন স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ করবে, তখন স্রষ্টা ডাকবে যে, আমি তোমাকে আহ্বান করছি তুমি আমার দিকে আসো বা তোমার এই কার্য্যাবলীতে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। আল্লাহ্‌ সন্তুষ্টি সাধিত হলে, সেই সন্তুষ্টির ফলশ্রুতিতে এই রহিম রুপের আবির্ভাব হয়। তখনই তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়। তখনই এই বিশেষ নামের সারকথা বান্দা উপলব্ধি করতে পারে বা বুঝতে পারে। এটাই হলো এই রহিম।

তাহলে ক্ষমা প্রাপ্ত যদি না হয় তাহলে এই বিস্‌মিল্লাহর কার্যকারিতা ফলবে না। আল্লাহ্‌পাক যুগে-যুগে, কালে-কালে নবী-রাসুলদেরকে পাঠিয়ে এটা প্রমাণ করেছেন যে, যদি বিস্‌মিল্লাহ পরিশুদ্ধ হয় এবং এই পরিশুদ্ধ হবার পরে বিস্‌মিল্লাহর জালুয়া বা বরকতের কার্যকারিতা ফলে। আপনারা জাগতিক ভাবে শুনে থাকবেন যে, অনেক বড় একজন জবরদোস্ত খাতক ছিলেন। আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি বিস্‌মিল্লাহ্‌ বলে তাকে মাত্র তিনটি রুটি খেতে দিয়েছিলেন। সেই বড় খাতকের কাছে এই তিনটি রুটি খাওয়া হাস্যকর মনে হয়েছিল।

তিনি ভেবেছিল আমি এত বড় একজন খাতক আর আমাকে দেওয়া হয়েছে মাত্র তিনটি রুটি। অথচ বিস্‌মিল্লাহর জালুয়া বা বরকতের কার্যকারিতা ফলবার কারণে তিনি মাত্র এই তিনটি রুটি খেয়ে শেষ করতে পারেনি।

তাহলে বরকতের জালুয়াটা যিনি খাতক ছিলেন তার প্রতিফলন হয়নি, প্রতিফলনটা হয়েছে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধির দ্বারা। কেন ? কারণ উঁনি গাফুরুর রহিম এর যে প্রক্রিয়াটা, সেটা নিজের ধারণকৃত ব্যবস্থার দ্বারা সুসম্পন্ন করেছিলেন। তাঁর এই রহিম রুপের দান থাকবার কারণে এর ফলপ্রসূ বা কার্যকারি ব্যবস্থা জারী হয়। এই প্রক্রিয়াতেই হয় হলো দয়ালু অর্থাৎ আমি দয়া পাবার উপযুক্ততা বা তাঁর পরিপূর্ণতার কেন্দ্রে যখন উপবিষ্ট হয়েছি তখনই আল্লাহ্‌ আমার প্রতি এই দয়া বর্ষণ করেন। এই দয়ার প্রেক্ষাপটে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিগণ পরিচালিত হয়। এটাকে একটু সহজ ভাবে বুঝবার জন্য নিম্নে আরও একটু আলোচনা করছি।

রাসুলেপাক (সঃ) যখন ধর্মীয় কারিকুলাম প্রচারের জন্য বা এই ইসলাম ধর্মকে একটি বিস্তৃত ভাব ধারায় জারী করবার জন্য প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন। রাসুল (সঃ) এর আপন চাচা আবুজাহেল উনার একটি গ্রুপ ছিল রাসুলের (সঃ) ধর্ম বা তাঁর বিধানকে নশ্বাৎ করবার প্রক্রিয়াতে। আমি সংক্ষিপ্ত আকাড়ে বলছি:- রাসুল (সঃ) কে বলা হলো, আপনি যদি এই চন্দ্রকে কেটে দ্বিখন্ডিত করতে পারেন তাহলে আমরা সবাই আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনব বা কলেমা পড়ে মুসলমান হব। তখন রাসুলেপাক (সঃ) চুপ হয়ে রইলেন। এর কিছুক্ষণ পর জিব্রাইল আমিনের আগমন ঘটল এবং তিনি বললেন, হে রাসুল (সঃ) আপনি আপনার আঙ্গুলি নির্দেশ করুন চন্দ্র স্ব-সম্মানে কেটে দ্বিখন্ডিত হয়ে যাবে। আল্লাহ্‌র হাবিব আঙ্গুলি নির্দেশ করার পর চন্দ্র স্বসম্মানে কেঁটে দ্বিখন্ডিত হয়ে গিয়েছিল। এটাই ছিল রহিমের দান। তাহলে এই দানের প্রক্রিয়ায় আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিগণ যে ধর্মে বিস্তার করে থাকেন। এই কারিকুলামের মধ্যে মানুষ যদি তরান্বিত হতে পারেন, সেই তরান্বিত গতি ধারা এরকম প্রক্রিয়াতে সু-সম্পন্ন হয়ে থাকে। তাই এই বিশেষ প্রক্রিয়া হলো রহিমের দান।

তাহলে বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম, এই আয়াতের যে কারিকুলাম সেই কারিকুলামের মধ্যে প্রথমেই বলা হলো যে:- বিস্‌মিল্লাহ বা আল্লাহ্‌র নামে শুরু, মাঝে হলো আর-রহ্‌মান যিনি দয়াল দাতা বা সকল নেয়ামতের অবয়ব এবং

সর্বশেষ হলো আর-রহিম যিনি দয়ালু অর্থাৎ ক্ষমার পরের একটি অবয়বের দান। এজন্য যিনি দয়ালু তাঁকে লাভ করবার জন্য সুফিদের অনুসরণ অনুকরণ বা তাদের কার্য্যাবলী তরান্বিত করবার প্রচেস্টা থাকতে হয়। এজন্য মূল ধারার যে আকিদা বা বিষয়বস্তু সে দিকে ধাবিত হবার জন্য প্রচেষ্টা করতে হবে।

তাই সুফিদের বা তাসাউফধারীদের কার্য্য হলো: মানুষ রুপে যাদের দুনিয়াতে আবির্ভাব ঘটেছে, তাদের স্রষ্টার রুপে রঞ্জিত হওয়া বা স্রষ্টার প্রেমময়ীতার সঙ্গে নিজেকে প্রেমময় বা প্রেম করা। প্রশ্ন হলো কি দিয়ে প্রেম করব ? তাঁকে তো দেখি নি ? দেখার প্রক্রিয়াতে আসলে ইখলাস বা একত্ত্ববাদে আল্লাহ্‌তে লীন হতে হয়। ইখলাস শব্দের অর্থ হলো একত্ত্ববাদ। তাহলে একত্ববাদ কি ? সুরা ইখলাসের প্রথম আয়াতে আল্লাহ্‌পাক বললেন:- কূলহু আল্লাহু আহাদ। অর্থ:- বলো আল্লাহ্‌ একক। অথচ আমরা সবাই আল্লাহ্‌কে এক বলে জেনে থাকি বা মনে প্রাণে লালন করে থাকি। কিন্তু আল্লাহ্‌ বলেছেন আমি একক।

পার্থক্যটুকু আপনাদের ধরিয়ে দেই। যারা আরবি জানেন তাদের জন্য বোঝাটা সহজ হবে। আরবিতে যারা পান্ডিত্য বা অনেকেরই আত্মীয়-স্বজন সৌদি আরবে বিভিন্ন কারণে বসবাস করে থাকেন, তাদের কাছে শুনে থাকবেন যে, আরবিতে ওয়াহেদ শব্দের অর্থ হলো এক। কিন্তু আল্লাহ্‌পাক তাঁর কালামপাকে কখনই বলেন নি যে:- কুলহু আল্লাহু ওয়াহেদ, বলো আল্লাহ্‌ এক। আল্লাহ্‌ বলেছেন হলো:- কূলহু আল্লাহু আহাদ। আহাদ শব্দের অর্থ হলো একক। অর্থাৎ একক, অখন্ড, অদ্বিতীয়, স্বয়ংভূ সত্ত্বা। যে সত্ত্বার কোন বিলয় হয় না। যার কোন পরিবর্তন নেই, যার কোন ভাঙ্গাচুড়া হয় না, যার কোন বিভাজনকৃত ব্যবস্থা নেই। সেই সত্ত্বাকেই বলা হয় আহাদ। তাহলে আল্লাহ্‌ বললেন এই আহাদ শব্দের অর্থ হলো একক সত্ত্বা। এই এক আর একক এর যে বিভাজনকৃত ব্যবস্থা, এইটা সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণা নেই বা বোঝার চেষ্টা করি না। ধারণা না থাকার কারণে আমরা একটি গোঁজামিল ব্যবস্থার মধ্যে ধর্মীয় দর্শনকে দাঁড় করাই।

জাগতিক ভাবে যারা আমাদের প্রচিলত ধর্মের আলেমগণ, যারা আমাদের ধর্মের শিক্ষা দেন তারা বলে থাকেন যে আল্লাহ্‌ এক। এক আর এককের পার্থক্যটুকু যদি আপনারা বুঝতে না পারেন তাহলে ধর্মের মধ্যে ল্যাঁবড়া হয়ে যায়। অর্থাৎ ধর্মের মূল ধারায় পৌঁছাতে আপনার খুব কঠিন হয়ে যাবে।

সেই সত্ত্বা – ১৪

বুঝতেই পারবেন না যে আমি বা আপনি ধোকার মধ্যে রয়ে গেলাম!

তাহলে আয়াতে কালামে বলা হলো: কূলহু আল্লাহু আহাদ। অর্থ:- বলো আল্লাহ্ একক। এক বলতে আমরা সবাই বুঝি এই শাহাদৎ আঙ্গুলটাকে ইশারা করলে একের নিদর্শন বা দৃষ্টান্তে একের প্রতীক বুঝানো হয়।

তাহলে প্রশ্ন হলো একক কী ? এই এককটুকু আপনাদের প্রচলিত একটি ব্যবস্থা দ্বারা বোঝানোর চেষ্টা করি। সেটা হলো:- আপনারা সবাই ওজনের বাটখারা চিনে থাকবেন এবং এই ওজনের ১ কেজি নামের একটা পাথর আছে, আপনারা সেটাও হয়ত চিনে থাকবেন। তাহলে এটাকে বলা হয় হলো ওজনের পরিমাপক। এই ওজনের পরিমাপক হলো কেজি। এটা হলো আমেরিকার স্টান্ডার্ড, আগে বৃটিশ ছিল তখন সের ছিল। আজকের আধুনিক বর্তমান যুগের হাল জামানার ছেলেমেয়েরা তারা কেজিও ভুলতে বসেছে, কারণ এখন ডিজিটাল প্যাকেট পদ্ধতি এসেছে। যাই হোক এই আমেরিকার স্টান্ডার্ড অনুযায়ী আমাদের প্রচলিত মাপের যে বাটখারা সেটার নাম হলো কেজি।

তাহলে এই কেজিটা মেট্রিক পদ্ধতি, এই পদ্ধতিতে ওজনের পরিমাপ কেজি। তাহলে আমাদের এই অঞ্চলের নাম হলো কায়েমকোলা, এখানে বিভিন্ন দোকানপাট বা পণ্যের যে মাপকাঠি পরিমাপ করা হয় বা ওজন করা হয়, এখানে যে কেজি পাবনা থেকে যদি এখানে মাল বা পণ্য আনায়ন করা হয় তাহলে সেখানে এই একই পরিমাপ বা কেজি। তাহলে কায়েমকোলা আর পাবনার কেজির বা পরিমাপের মধ্যে কিন্তু কোন পার্থ্যক্য নাই। এক কেজি লবন পাবনা গেলে কি দুই কেজি হবে ? তাহলে এক কেজি, এক কেজিই থাকবে। আবার পাবনা থেকে যদি ঢাকাতে রুপান্তর করি তাহলে ঢাকার এক কেজি পাবনার এক কেজি কায়েমকোলার এক কেজি, সব কিন্তু একই পরিমাপ, কোন পার্থক্য নেই।

তেমনি যদি ঢাকা থেকে চিটাগাং নিয়ে যায় মিল ফ্যাক্টরীতে, সেখানে যে কেজি এখানেও সেই একই কেজি । তেমনি সারা পৃথিবীতে ওজনের পরিমাপক হলো কেজি। এক কেজিতে সকল জায়গায় সমান পরিমাপ বহন করে। এখন কিছু অসাধু ব্যবসায়ী বা কিছু মোনাফা খোঁড় যদি এটাকে কম বেশি করে থাকে, তাহলে সেইটা দূর্নীতিগ্রস্থ ব্যবস্থা, সেটা ভিন্ন কথা।

তাহলে এক কেজি হলো ওজনের একটি পরিমাপ। সকল জায়গায় এই পরিমাপ নির্দিষ্ট মানে একই।

তাহলে এটা কি ? ওজনের একটি পরিমাপ। তাই ওজনের পরিমাপকে একক হিসাবে বলা হয় কেজি। তাহলে এই কেজি গুলোকে যদি সমগ্র দুনিয়ায় যত কেজির বাটখারা বা পাথর রয়েছে, সবগুলোকে যদি আমরা এক জায়গায় নিয়ে এসে দাঁড় করাই তাহলে পাহাড়ের সমান হয়ে যাবে বা পাহাড়ের চাইতে বড় আকারও ধারণ করতে পারে। কিন্তু আসলে প্রতিটি এক কেজির মান কিন্তু এক কেজিই রয়েছে। কমও নেই বেশিও নেই। তাহলে ওজনের পরিমাপক হলো কেজি। আল্লাহ্ ঠিক একক বা আহাদ। এই আহাদ শব্দের অর্থ হলো:- একক, অখন্ড, অদ্বিতীয়, স্বয়ংভূ সত্ত্বা ঠিক এই কেজির পরিমাপক ব্যবস্থার মতই সমাসীন প্রতিটি মানুষের মধ্যে। অর্থাৎ পৃথিবীর ইতিহাসে ৭৫০ কোটির উপরে মানুষ বাস করে। তাহলে প্রতিটি মানুষের সঙ্গে আল্লাহ্ এই আহাদ বা একক রুপে বিরাজিত।

কোরানুল মাজিদের আয়াতে কারিমায় বলা হয়েছে যে:- নাহনু আকরাবু ইলাহি মিন হাবলিল ওয়ারিদ। অর্থ:- আমরা তোমার শাহারগের নিকটে রয়েছি। এই এক কথাতে আল্লাহ্ পরিপূর্ণ ভাবে সকল বিষয়কে পরিষ্কার করে দিয়েছেন। সেটাই হলো:- কূলহু আল্লাহ্ আহাদ। অর্থ:- বলো আল্লাহ্ একক। তাহলে আল্লাহ্ যে প্রতিটি মানুষের সঙ্গে বিরাজিত দলিল এভাবে বলছে।

তাহলে প্রতিটি মানুষের সঙ্গে আল্লাহ্ বিরাজিত। তাহলে আমার মধ্যে যে আল্লাহ্ বিরাজিত আছে, আপনার মধ্যে কোন আল্লাহ্ বিরাজিত আছে ? এই একক সত্ত্বায় বিরাজিত প্রতিটি মানুষের মধ্যে একই আল্লাহ্ বিরাজিত রয়েছেন। তাহলে আমরা সেই আল্লাহ্র তালাশ বা অনুসন্ধানগামীর যে ব্যবস্থা, সেই দিকে পরিগমন না করে লেবাসের একটি আশ্রিত ব্যবস্থার মধ্যে ধর্মকে বেঁধে রাখার প্রচেষ্টা করে আল্লাহ্কে তালাস করে চলেছি।

প্রতিটি ধর্ম আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এযাবৎ কাল পর্যন্ত আঁড়াইশতের অধিক পৃথিবীতে ধর্মের অনুসারীগণ রয়েছে। প্রত্যেকেই তার স্বীয় নিজ নিজ ধর্মের অবলম্বনে তার স্রষ্টা বা তার মাবুদ কে সে খুঁজে থাকে। ধর্ম এসেছে হলো স্রষ্টার প্রণিত ব্যবস্থায় তাঁকে লাভ করবার জন্য।

তাঁকে কিভাবে লাভ করা যায়, সেই দিক নির্দেশনা গাইড হিসাবে বা সংবিধান হিসাবে ধমর্কে দাঁড় করিয়েছে। তাহলে সেই ধর্মের মূল চালিকাশক্তি বা চাবিকাঠি একটি আপেক্ষিক পরিচিত ব্যবস্থার মাধ্যম দিয়ে আহাদ সত্ত্বাকে লাভ করা। তাই আল্লাহ্ বলছেন:- কূলহু আল্লাহু আহাদ। অর্থ:– বলো আল্লাহ্ একক। যদি এখানে এক বলা হয় তাহলে আমার আল্লাহ্ দৃশ্যমান হলে আমি এই আল্লাহ্কে কনসেপ্ট করে যদি আটকিয়ে ফেলি, তাহলে সমগ্র ভূমন্ডল, নভোমন্ডল, পৃথিবী, বিশ্ব, সবকিছু আটকে যাবে আর কিন্তু নড়াচড়া করতে পারবে না। কারণ একটাই আল্লাহ্, এটা প্রচলিত ভাবধারায় বলা রয়েছে, কিন্তু সুফিমতে বা গুরুবাদি ব্যবস্থায় এটা থিসিস বা গবেষণা করে দেখা গেছে যে, আল্লাহ্ একক।

তাহলে এই একক সত্ত্বা হলো নির্ভূল। এই নির্ভূলতা খুঁজতে গেলে গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। তাহলে আল্লাহ্ এক, বিনা দলিলে আল্লাহ্ এক এভাবে অনেকেই মানুষকে বুঝিয়ে থাকে। কিন্তু ওটা হলো রুপক বোঝানো হয়েছে। কিন্তু মূল সত্ত্বার ধারাবাহিক প্রণালী যদি এক হয়, তাহলে অনেক ওলিগন যেমন মুনসুর হাল্লাজ বলেছেন:- আনাল হক। অর্থ:-আমিই আল্লাহ্ বা আমিই সত্য। মুনসুর হাল্লাজ যদি আল্লাহ্ হন, তাহলে আল্লাহ্র আর তো কোন অস্তিত্ব থাকে না, আল্লাহ্ বন্ধন হয়ে যায়। তাই আয়াতে কারিমায় যদি বলা হয় যে বলো আল্লাহ্ এক, তাহলে মুনসুর হাল্লাজের কাছে আল্লাহ্ আটকে গেছে। তাহলে আল্লাহ্ আর কোথায় ? তাহলে আল্লাহ্ আর নেই ? নাস্তিক্যবাদ এসে যায় যদি এভাবে বিশ্লেষণ করা হয়। কিন্তু আমাদের বিষয়টা তা নয়।

আয়াতে কারিমায় আল্লাহ্পাক বলেছেন:- কূলহু আল্লাহু আহাদ। অর্থ:- বলো আল্লাহ্ একক। এই একক যদি মানুষ বুঝে, তাহলে সবার মধ্যে আল্লাহ্ সত্ত্বা বিরাজিত এ কথা মেনে নেওয়া হয়, তাহলে গুরুবাদ এসে যায় বা পীরতন্ত্র এসে যায়। যার কারণে যারা পীর বা মোর্শেদকে মানবে না তারা এই আয়াতে কারিমার অর্থকে এভাবে রুপান্তর করেছে, আল্লাহ্কে এক বলে আমাদের মাঝে চালিয়ে দিয়েছেন কিন্তু আল্লাহ্ হলো একক।

এটাকে আমরা আরেকটু উপস্থাপিত বিষয় হিসাবে মেলে ধরতে চাই:- তাহলো বিষয়টা এমন দাঁড়ায় যে:- সৃষ্টি রাজ্যে জন্ম দেওয়ার মালিক আল্লাহ্, মৃত্যু

দেওয়ার মালিকও আল্লাহ্। আল্লাহ্র নির্দেশক্রমেই তো হয়ে থাকে। তাহলে পৃথিবীর ইতিহাসে ৭৫০ কোটিরও অধিক মানুষ রয়েছে। তাহলে প্রতিটি মানুষের জন্ম হার এবং মৃত্যু হারকে যদি আমরা গাণিতিক ভাবে একটি বিশ্লেষণে আনি, তাহলে প্রতি সেকেন্ডে যে পরিমাণ আল্লাহ্ কুন বললে হয় অর্থাৎ সৃষ্টি হয় বা জন্ম লাভ করে এবং ফায়াকুন বললে যে পরিমাণ ধ্বংস হয় বা মৃত্যু বরণ করে। তাহলে এই জন্ম এবং মৃত্যুর হিসাবটাই শুধু আল্লাহ্ অবারিত ভাবে যদি বলেন, কুন-ফায়াকুন, কুন-ফায়াকুন, কুন-ফায়াকুন তবুও এটা সময়ে কভার হয় না। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে হিসাব।

তাহলে এটা কি ? আসলে এটা বুঝবার জন্য এই একক সত্ত্বাকে যারা মানে না তারা এরকম বিভাজনকৃত এমন কিছু দাঁড় করিয়েছে যে, ধর্মের প্রতি মানুষের অনিহা হয়ে গেছে। এই অনিহার কারণে আজকে আল্লাহ্র প্রতি মানুষের বিশ্বাস উঠে যাচ্ছে। মানুষ ভ্রান্তির দিকে চলে যাচ্ছে। তাই এই ভ্রান্তি অপসারিত করবার জন্য ধর্মকে বুঝতে হলে সুফিদের আকিদায় যারা ওলি মাশায়েখগণ, তাদের দ্বারা কোরানুল মাজিদের যে সকল তাফসির রয়েছে, সেগুলোকে একটু অর্থ করবার জন্য অনুরোধ রাখি।

কারণ আমরা দুনিয়াতে আসছি, সবারই মৃত্যু রয়েছে। আয়াতে কারিমায় আল্লাহ্পাক বলে দিয়েছেন যে, কুল্লু নাফছিন জায়িকাতুল মউত। এখানে কিন্তু নফ্সের কথা বলা হয়েছে, শুধু মানুষ মারা যাবে এমন কথা আসেনি। তাহলে এই মৃত্যু অবধারিত। কার ? নফ্সের । তাহলে নফ্সধারি আত্মা যা কিছু রয়েছে শুধু মানুষ নয়- গোটা দুনিয়াতে যত জীব রয়েছে তাদেরও মৃত্যু বরণ করতে হবে। তাহলে আমাদের সবাইকে একদিন মৃত্যু বরণ করতেই হবে এটা থেকে নিস্তার নেই। যার জন্ম হয়েছে তাকে মৃত্যু বরণ করতেই হবে। এই মৃত্যু পরবর্তী ব্যবস্থার জন্য এই বিধান বা ধর্ম এসেছে।

ধর্মের আকিদা সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে হলে এই ইখলাস পয়দা করতে হবে। সুরা ইখলাস আমি পড়লাম আর সওয়াব পেলাম এটা নয়। আসলে এই ইখলাসকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। অর্থাৎ এই একত্ত্ববাদে নিজেকে লীন করবার জন্য এই আয়াতে কারিমাগুলো দৃষ্টান্ত স্বরুপ বা এটা সংবিধান স্বরুপ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বান্দার জন্য পাঠানো হয়েছে।

তাহলে এটা হলো সুফিদের আকিদা অর্থাৎ কোরানুল মাজিদকে তাঁরা আয়ত্ত্বে রাখে নিজের দেহ ভূবনে। এটাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার কলাকৌশল সম্পর্কে তাঁদের ভক্তবৃন্দকে আমল নীতিতে দাঁড় করানোর চেষ্টা করেন।

তাহলে সুরা ইখলাসের প্রথম আয়াতে আমরা বুঝতে পারলাম যে, আল্লাহ্ একক। একক সত্ত্বা বলতে এই আল্লাহ্ একক রুপে প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে বিরাজিত রয়েছেন। অর্থাৎ আমার ভিতরে যে আল্লাহ্ রয়েছে সেটার যে রুপ, সেটা যে রকম, আপনার মধ্যে যে আল্লাহ্ রয়েছে সেটাও ঠিক সেই একই রকম। তাহলে প্রতিটি মানুষের মধ্যে একই রকম আল্লাহ্ সত্ত্বা বিরাজিত।

তাহলে ধর্ম কি সুক্ষ্ম আর চালাকির মাধ্যম দিয়ে আমরা আমাদের কাছে পেয়েছি। সুফি বা ওলি মোর্শেদ প্রদত্ত্ব রাস্তাকে যদি অবলম্বন করা না হয়, তাহলে এই বিষয়ে কোন দিক নির্দেশনা বা কার্য্যকারিতা মিলবে না। এটা শুধু কথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। তাই আয়াতে কারিমায় সুস্পষ্টভাবে সকল ধোঁয়া আর কুয়াশা ডিভাইডেট করে দিয়ে একটি সৌন্দর্য্যের উপর দাঁড় করেছেন। আমরা সবাই জানি আল্লাহ্ এক। এটার উপরেই বিশ্বাস বা একিনে দন্ডায়মান হয়েছি। যদি আল্লাহ্ এক হত, আল্লাহ্ তাহলে কিভাবে প্রতিটি মানুষের জীবন রগের সঙ্গে থাকে ? পবিত্র কালাম পাকে আল্লাহ্ বলছেন, আমি চারটি শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে থাকি। সেগুলো হলো:-

(১) সাবেরিন - ধৈর্য্যশীলদের সঙ্গে।
(২) মোহসিনিন - সৎ কর্মশীলদের সঙ্গে।
(৩) মমিনিন - মমিনদের সঙ্গে।
(৪) মুত্তাকীন - মোত্তাকীনদের সঙ্গে।

তাহলে এই কালামপাক যাদের আয়ত্ত্বে রয়েছে তাদের সঙ্গেই আল্লাহ্ জাগ্রত অবস্থায় থাকে। এর প্রমাণটা তাঁরাই দিতে পারবেন, যারা এই আল্লাহ্কে একক রুপে দৃশ্যমাণ করতে পেরেছেন, তিঁনিই এটা ধরতে পারবেন। আমার আর আপনার শুধু মুখে বলা ছাড়া অন্য কিছু হয় না। এটা জানতে হলে আল্লাহ্র এই একত্ত্বাবাদে নিজেকে সমাসীন করতে হবে।

যদি আল্লাহ্ এক হয় এবং তিঁনি যদি ধৈর্য্যশীলদের সঙ্গে থাকেন, তাহলে আমি বা আপনি কী ?

তাহলে আল্লাহ্ কী আমাকে বা আপনাকে সৃষ্টি করে কলঙ্কিত করেছেন ? তাই যে বোঝে না সে কখনও স্বীকার করে না এবং সে বড় জ্ঞানী সাঁজতে চায়। জজ বার্নড শো বলেছেন:- মিথ্যা জ্ঞান হতে সাবধান, এটা অজ্ঞতার চেয়েও বিপদ জনক। এজন্য তারা ধর্মে মন্দের আশ্রয় আর অবতারণাকে অবলম্বন করে মানুষকে ধর্মান্ধারিত করার চেষ্টা করে। এটাই শয়তানি সত্ত্বা। এই শয়তানি সত্ত্বার জাগরণ যাদের মধ্যে ক্রিয়া আছে তারা সত্যকে অস্বীকার করে। আর ভাল করে খেয়াল রাখবেন সত্যকে অস্বীকারকারী হলো কাফের, এটা চূড়ান্ত কথা।

তাহলে সাবেরিন, মোহসিনিন, মমিনিন, মুত্তাকিন যারা আল্লাহ্র এই গুন সম্পন্ন ক্রিয়াতে সমাসীন হয়ে আল্লাহ্কে নিয়ে পরিচালিত হয়, তাদের সাথে আল্লাহ্পাক সংযুক্ত থাকে। এই সত্ত্বাকে জাগরিত করবার জন্য ওলিগনের যে ক্লাস বা যে ধারাবাহিক প্রণালীর শিক্ষা ব্যবস্থার মানদন্ড দাঁড় করিয়েছেন।

এটার উদ্দেশ্য হলো একটি দেহকে প্রথমে পবিত্র করার অনুশীলন করা। পবিত্রতা অর্জন ব্যতিত আল্লাহ্ একক, এটা কারো বোঝার সাধ্য নেই বললেই চলে, সে বুঝতে পারবে না। কুরানুল মাজিদে সুরা আশ-শামস্ এর ৯ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ্পাক বলেছেন:- ফাদ আফলাহা মান বাক্কা-হা।

অর্থ:- যে নিজেকে আত্মশুদ্ধ করে সেই সফলকাম হয়। অর্থাৎ আত্মশুদ্ধ বা পবিত্রতা অর্জন করলেই সে সফলকাম বা কল্যাণকর হয়। তাহলে আয়াতে কারিমায় প্রথমেই বলা হলো :- কূলহু আল্লাহু আহাদ। অর্থ:– বলো আল্লাহ্ একক। একটি দেহ যখন পবিত্রতার স্বাদ গ্রহন করবে অর্থাৎ দেহের মধ্যে যখন একটি মন্দের আঁশও স্থান পাবে না, তখনই এটা প্রমাণ হবে। সাধক কী শুধু তার সাধনা রাজ্যে থাকে ? তাহলে এটাই তার একটি সত্যায়িত অবয়ব জারী হয়। যে অবয়বকে সে ধারণ করলে সে বুঝতে পারে অর্থাৎ তার দেহটাকে যে পবিত্র করার অনুশীলনটা করেছিল সেটারই ফল। এই অনুশীলন কী কোন দিন শেষ হবে না ? এই অনুশীলনের কী কোন অবসান নেই ? এই বিষয়ে জানতে বা বুঝতে হলে আধ্যাত্মিকতার আশ্রয় নিতে হয়। তাছাড়া এটা বোঝা যায় না ?

তাই আধ্যাত্মিকতার অনুশীলন হলো একটি শ্বাশত সত্যের অবয়ব। আর এটা যে সত্য, একটি দেহ অনুশীলন বা যে মোরাকাবা মোশাহেদাগুলো সাধকগণ করে থাকেন এবং এই মোরাকাবা মোশাহেদার অবয়ব যখন তার উপর জারিকৃত হয় তখন সে ধীরে ধীরে বুঝতে পারে। একটি দেহের মন্দের সকল অবতারণা যখন দূরিভুত হবে, তখনই মওলা সত্ত্বার অবয়ব সেই দেহতে জাগ্রত হয় আর জাগ্রত হলে সেই মানুষের সকল বিষয়াবলী তৌহিদে রুপান্তর হয়।

সেই মানুষের সকল বিষয়াবলী তৌহিদে রুপান্তর কেমন করে হয় তা একটু বুঝিয়ে বলি। জাগতিক ভাবে আপনারা শুনে থাকেবেন। সেটা এরকম যেমনঃ এই হাত, এই হাত কিন্তু আমার না। কারণ আমি এই হাত দ্বারা ইহকালে যত পাপ করছি বা করতেছি, সেই পাপের সাক্ষ্য এই হাতটা পরকালে আমারই বিরুদ্ধে কথা বলবে বা সাক্ষ্য দিবে। এই পাঁ দিয়ে আমি কোথায় পরিগমন করি, সেই পরিগমনের সাক্ষ্য হলো এই পাঁ দিবে। আমি এই মুখ দিয়ে যে ধান্দাবাজির জবান বা মন্দের প্রকাশ করি, এই মুখ সেটারই সাক্ষ্য মওলার কাছে দিবে। তাহলে তারা কেউ আমার না কিন্তু আমার সাথে রয়েছে।

তাই একটি দেহ যখন পবিত্র হয় তখন তারা (হাত,পাঁ,মুখ ইত্যাদি) সচল বা জাগ্রত হয়। এই হাত আপনার সাথে কথা বলবে । এই পবিত্রটা যে একবার করবে, সে সফলকাম হবে। এটা যদি কেউ করতে পারে, তাহলে এই সকল তৌহিদের সঙ্গে কথোপকথন করে আপনাকে আবার নতুন করে ওয়াদাবদ্ধ করে তাদেরকে আটকিয়ে দিতে হবে। আল্লাহ্‌র সঙ্গে যে ওয়াদাবদ্ধ হয়ে দুনিয়াতে এসেছি, ফিরে গিয়ে আপনার আবার তাঁর কাছে এ বিষয় নিয়ে দন্ডয়মান হতে হবে। আপনার আর মওলা সত্ত্বা দুইয়ের কথোপকথন হবে, এখানে শয়তানি বা মন্দ সত্ত্বা থাকে না এবং আপনার পীর বা মোর্শেদও থাকে না। লাওৎস (আঃ) বলেছেনঃ- যখন তুমি প্রস্তুত তখন গুরু আসেন, যখন তুমি একেবারেই প্রস্তুত তখন গুরু উধাও হয়ে যান। পীরকে যে আপনি ভজেন, এই পীরের কাজ হলো এই ধরিয়ে দেওয়া পর্যন্ত ডিউটি। পীর হলো ওস্তাদ। এই ওস্তাদি হলো দেহতে বা আত্মাতে থাকে । তাই এই ওস্তাদির স্বাদ যিনি পেয়েছেন, তাঁকে আর ধর্মান্ধারিত করা যায় না। যে করতে পারে তাঁর সঙ্গেই এদের (হাত, পাঁ, মুখ ইত্যাদি) কথা হয় বা প্রমাণিত হয়। তাঁকে আর কোন যুক্তি দিয়ে বোঝানোর দরকার হয় না। এটাই আধ্যাত্মিক।

মনে রাখবেন: আপনারা যারা আত্মার মুক্তির রাস্তায় বা আহলে বায়াতে দাখিল হয়েছেন, আপনাদের এক জন্মে যদি না হয়, যদি শত জন্মও লাগে তবুও এদেরকে ওয়াদাবদ্ধ করে নিয়ে, আত্মার মুক্তির চেষ্টা করবেন।

কি আর আপনাদের বোঝাবো ? কারণ বর্ণনাতে তথাকথিত আলেম সমাজ ধর্মের যা করেছে, সামান্য কিছু ব্যতিত ধর্মের আর কিছু থাকে না। কারণ তারাই মূল হয়ে বসে আছে। এই আল্লাহ্কে এক বলে গোটা দুনিয়ায় মানিয়ে নিয়েছেন কিন্তু আল্লাহ্পাক বলেছেন: বলো আল্লাহ্ একক। কি ভাবে মানেন ? আপেক্ষিকতার রং ঢং জুব্বার বাহাদুরি এগুলো কোন ধর্ম নয়। হযরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন যে:- যেখানেই জ্ঞান পাবে তা অর্জন করে নিও, কিন্তু ফিকাহ শাস্ত্রের পন্ডিতদের (মোল্লা-আলেমদের) নিকট যেওনা, কারণ এরা খোঁয়াড়ে বাস করা মানুষ রুপী ভেড়ার দল। কারণ রাসুল (সঃ) বলছেন:- "যার মধ্যে এই গুপ্ত ইলম বা আধ্যাত্মিকতা নেই, সে যদি হাজার বছরও ইবাদত করে তবুও তার কোন ইবাদত বন্দেগী কবুল হবে না" আমরা বর্তমান সমাজে কিসের অনুশীলন করি ? এই এক্সারসাইজ বা ব্যয়্যাম দিয়ে স্রষ্টাকে লাভ বা পূর্ণতা হবে এটা উঁনি দিয়েছেন ? তাহলে কিসের অনুশীলন আপনি করছেন ?

তাই একত্ত্ববাদ হলো আল্লাহ্র প্রতি প্রাথমিক ভাবে নিজেকে উৎসর্গ করতে হয়, প্রজ্ঞা, বুদ্ধি, বিবেক, মন আর জ্ঞান দ্বারা সারেন্ডার হতে হয় । আল্লাহ্ ব্যতিত কিছুই নেই, আল্লাহ্ ব্যতিত কিছুই করবার থাকে না। আমার সকল ক্রিয়াকর্ম যেন এই মওলার হয়, এভাবে নিজের মনকে গুছিয়ে নিতে হয়। মওলা যদি অচৈতন্য বা অদৃশ্য হয় তাহলে আমার সাধন ভজনে কী হয় ? তাহলে আমার সাধন ভজনতো বিফলেও যেতে পারে। একজন দার্শনিক বর্ণনা করেছেন যে:- ফেইথ ইজ মিনিং লেস উইথাউট একচ্যুয়্যাল প্রাকটিক্যাল। অর্থ:- বিশ্বাসের এক পয়সাও মূল্য নেই যদি সে কিছু না দেখে। তাহলে কী দিয়ে বিশ্বাসকে মজবুত বা দৃঢ়করণ করব ? তাই এই মওলা রুপে একজন পীর বা মোর্শেদ কে গ্রহন করতে হয় এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয় এবং তাঁর দাসত্ব করতে হয়। কারণ তিঁনি মওলাকে ধরিয়ে দেওয়া সম্পর্কে পরিগত। তাই যিনি জানেন, তিঁনি আপনাকে সেটা দেখিয়ে দিতে পারেন। পাবনা শহর কোথায় অবস্থিত সেটা যদি আমি জানি আর আপনি যদি সেখানে গমন করতে চান,

সেই সত্ত্বা – ২২

তাহলে আমি সহসাই সেখানে আপনাকে নিয়ে যেতে পারব বা সেই পথ সম্পর্কে আপনাকে বলে দিতে পারবো। তাহলে যিনি আল্লাহ্ সম্পর্কে পরিজ্ঞাত, তিনি সেই ঠিকানায় একটি মানবকে পৌঁছে দিতে কী করতে হয়, সেই করণতব্য বিষয়টা তিঁনি নির্ধারণ করে দিতে পারেন। তাই ওলি বা মোর্শেদ এই অনুশীলন বা মোরাকাবা মোশাহেদা গুলো দিয়ে থাকেন। এটা হলো স্রষ্টা প্রাপ্তির অনুশীলন।

এজন্য আয়াতে কারিমায় বলা হলো:- কূলহু আল্লাহু আহাদ। অর্থ:- বলো আল্লাহ্ একক। আল্লাহ্ এবং বান্দা এই দুইটি সত্ত্বা একত্রে একটি দেহতে মিলন হলে সেটার নাম হয় আহাদ সত্ত্বা। এই একক হলো নির্ভূলতা, এখানে কোন ভূল নেই। নির্ভূলতার প্রেক্ষাপটে কালামপাকে আল্লাহ্ বলেছেন যে:- ইহা এমন একটি কিতাব যাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহর অবকাশ নেই। মানুষের যদি সন্দেহ হয় কোন আয়াতে কারিমা সম্পর্কে, তাহলে সেটা সম্পর্কে গভীরভাবে গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। নিঃসন্দেহে এখানে যদি কোন ভ্রান্তির অর্থ সন্নিবেশিত করা হয়, তাহলে এরকম চিন্তা চেতনার উদ্ভব আসতে পারে।

আল্লাহ্ অন্য আয়াতে বলেছেন যে এই কালাম পাকের মধ্যে কোন ভূল নেই। আল্লাহ্ তাঁর কালাম পাকে চ্যালেঞ্জ করেছেন যে:- কোন ভূল পাও কি ? তুমি খুঁটিয়া খুঁটিয়া দেখ কোন ভূল পাবে না, নিঃসন্দেহে তোমার চোখ বিষ্ফরিত হয়ে তোমারই কাছে ফিরে আসবে। এটাই আল্লাহ্র চ্যালেঞ্জ। তাহলে আমরা আয়াতে কারিমায় যে ভ্রান্তি বা ভূলের প্রদর্শন দেখতে পাই বা নিজেদের কাছে আফসেট মনে হয় এটা হলো আমাদের চিন্তা ধারার ভূল। আসলে আয়াতে কারিমায় কোন ভূল নেই। বাস্তবতার সঙ্গে আয়াতে কারিমার যে তারতম্য এটা হলো অনুবাদ বা অর্থের তারতম্যের কারণে ঘটেছে। এজন্য আল্লাহ্পাক কালামপাকে নির্ভূলভাবে উল্লেখ করেছেন যে:- কূলহু আল্লাহু আহাদ। অর্থ:- বলো আল্লাহ্ একক। অর্থাৎ তিঁনি একক শক্তিতে বিরাজিত।

আমরা পৃথিবীতে যতগুলো মানুষ সমবেত হয়েছি, এই সমবেত প্রত্যেকটি মানুষের সঙ্গে আল্লাহ্ একক সত্ত্বা রুপে বিরাজিত। পার্থক্য আর বিভাজনকৃত ব্যবস্থায় আমরা ধর্মের দন্ড বা কোন্দোলের কারণে মূল ধারা থেকে সরে গেছি বা ডাইভার্ড হয়ে গেছি। প্রচলিত যে কালামপাকটুকু আমরা পেয়ে থাকি সেখান থেকে আহলে বায়াতের বা জাতের মূল ধারার পাঁচ শতেরও অধিক আয়াত খন্ডিত করা হয়েছে। তাহলে কি দিয়ে এই ধমের্র মূল ধারা মানুষের

দোরগোঁড়ায় পোঁছায় ? একক এবং এক, এই দুইয়ের যে একটি পার্থক্য, এই পার্থক্যটুকু না বুঝলে ধর্মে জঞ্জাল সৃষ্টি হয়ে যায়, মনোরাজ্যে বিভিন্নতার প্রশ্ন আসতে পারে।

তাই সুফি মতাদর্শের আহলে সুফ্ফা রাসুলের (সঃ) অনুশারীগণ এক কথায় তাসাউফধারী, যারা আত্ম চৈতন্য ধারার জাগরনের মোরাকাবা মোশাহেদার শিক্ষা টুকু পেয়েছে, তাঁদের মাধ্যম দিয়ে এই ধর্মের মূল নিশানাটা জাগরিত হয়ে আছে। তাঁরাই এই মূল ধারার অনুশীলন অনুকরণ ব্যবস্থাগুলো মানুষের দোরগোঁড়ায় সঠিক ইরাদা অনুযায়ী তুলে ধরবার চেষ্টা করে। তা না হলে এই ধর্মের চক্রান্তের শেষ নেই। এক আর একক এর পার্থক্য যদি না বুঝি তাহলে গোঁজামিল হয়ে যায়। আল্লাহ্‌র ভারসাম্য বিভাজনকৃত ব্যবস্থার দিকে চলে যায়।

তাই একক সত্ত্বার জাগরণ ঘটাতে হবে, স্রষ্টার রঙে নিজেকে রাঙাতে হবে। তাঁর প্রেমময়ীতার সঙ্গে নিজেকে প্রেমময় করতে হবে। খাজা মঈন উদ্দিন চিশতী (রহঃ) বলেছেনঃ- প্রেমহীন ইবাদকারী হাজার রাকাত নামাজ দ্বারা যে স্তরে পৌঁছাবে, আল্লাহ্‌র প্রেমিক সে স্থানে এক হুংকারেই পৌঁছে যাবে। কিতাবে বর্ণনা করেছেনঃ- লা ইউতা আলাল আশেকীন। অর্থঃ- প্রেমিকের জন্য কোন ফতুয়াই নেই। তাহলে যিনি স্রষ্টার প্রেমিক হন তাঁর জন্য কোন ফতুয়া চলে না। আমার আধ্যাত্মিক বিধান বইটা যারা পড়েছেন তারা দেখে থাকবেন সেখানে রাসুলের (সঃ) একখানা হাদিস লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যেঃ- যে ব্যক্তি দুনিয়া তলব করে সে হিজরা, অর্থাৎ (পুরুষও নয় স্ত্রীও নয়) যে ব্যক্তি জান্নাত তলব করে সে আওরত, যে ব্যক্তি খোদাকে তলব করে সেই প্রকৃত পুরুষ।

তাহলে এই হাদিস খানার মধ্যে প্রথমেই বলা হলোঃ- যে কেবল দুনিয়া চাইল সে হিজরা, ছেলেও না মেয়েও না। আর যে জান্নাত চাইল সে আওরত। আওরাত এটা ফার্সি ভাষা, আওরত বলতে ফার্সিতে সুদর্শন মহিলাকে বোঝায়।

আমাদের এখানে যারা প্রবিন মুরুব্বিগণ রয়েছেন তাদের মুখে এই ভাষার বহিঃপ্রকাশ অনেক সময় ঘটে যায়। তৃতীয় ধাপে বর্ণনা করলেন, যে কেবল খোদাকে তলব করে সেই প্রকৃত পুরুষ। তাহলে এই হাদিস খানার তারতম্য অনুযায়ী আমরা যদি বলি যে আমরা আল্লাহ্‌র এত নেয়ামত বা সুযোগ সুবিধা

গ্রহন করবার পরেও আমরা আল্লাহ্মুখী হই না, তাহলে এটা কী ? আল্লাহ্মুখী হবার যে প্রক্রিয়া সেই প্রক্রিয়ায় যখন একজন মানব তরান্বিত হতে থাকবে বা হাঁটতে থাকবে, তার এই তরান্বিত গতিরও তো একটি সনদ আছে যে কতকাল এভাবে আমাকে হাঁটতে হবে ?

তার একটি সত্যায়িত সনদের বিশ্বাসের পঞ্চভূত বা আকিদার পরিপূর্ণতার একটি অবয়ব সেটাতো তার মধ্যে জারী হবে। না কি সারা জীবন শুধু আল্লাহ্কে চাই, আল্লাহ্কে চাই, আল্লাহ্কে চাই বললেই হবে ? তারও তো একটি পূর্ণতার অবগাহন আছে। যে পূর্ণতার অবগাহনে সিক্ত হলে সে পরিপূর্ণ ভাবে আত্ম তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলবে, আমি যে এতকাল যাবৎ ধরে এই অনুশীলনগামী ব্যবস্থার মধ্যে ছিলাম, সেই অনুশীলনগামী ব্যবস্থা আজকে আমাকে পূর্ণতার অবগাহনে সিক্ত করেছে। এটাই আমার আত্ম তৃপ্তি বা এটাই আমার চাওয়া ছিল। এই যে আত্ম তৃপ্তির বহিঃপ্রকাশ বা পরিপূর্ণতার একটি মানদন্ড। এই পরিপূর্ণতার মানদন্ড হলো একটি বিশেষ অবয়ব। এটা হলো ব্যক্তি কেন্দ্রিক ব্যবস্থা।

তাহলে আমাদের কি চাইতে হবে ? একমাত্র আল্লাহ্কে চাইতে হবে। এ বিষয়ে সুফি তাপসী রাবেয়া বসরী বর্ণনা করেছেন যে:- "আল্লাহ্ আমি যদি তোমার জাহান্নামের ভয়ে এবাদত বন্দেগী করে থাকি তাহলে আমাকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করে দাও। আর আমি যদি তোমার জান্নাতের লোভে বন্দেগী করে থাকি তাহলে আমাকে জান্নাত থেকে বঞ্চিত কর। আর আমি যদি একমাত্র তোমাকেই চাই, তাহলে আমাকে তোমার দর্শন থেকে নিরাস করো না বা আমাকে তোমার দর্শন দিও।

এর অর্থ কী ? আসলে সুফি মতাদর্শ থেকে যারা জন্ম চক্রের আবির্ভাবকৃত ব্যবস্থায় বা এক কথায় যারা আহলে বায়াতে দাখিল, সেই দাখিলকৃত ব্যবস্থার মূল নিশানা থাকে হলো স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ করা। এই স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ করতে হলে একত্ত্ববাদের যে ধারা, সেই ধারাতে নিজেকে নিয়োজিত বা দন্ডায়মান করতে হবে।

এই দন্ডায়মানকৃত ব্যবস্থার প্রাথমিক যে সোপান সেটাই চলে আসে এই গুরুবাদ বা আহলে বায়াত। কারণ আল্লাহ্কে দেখিনি, তাঁর সান্নিধ্য কিভাবে

লাভ করব ? কালামপাকে বর্ণনা করেছেন তোমরা আমার রঙ্গে রঞ্জিত হও। তাহলে আল্লাহ্‌কে পেলে তো তাঁর রং দেখব, তাঁর রং-ই তো দেখিনি। তাঁর রঙ্গে কিভাবে রঞ্জিত হব ?

এজন্য আল্লাহ্‌পাক সুরা ইয়াছিনে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে:- তুমি তাঁকে অনুসরণ কর, যে তোমার কাছে মুজুরী চায় না এবং হেদায়েত পাইয়াছে। এই হেদায়েত নামের ব্যবস্থাটাই তাঁর রঙ্গে রঞ্জিত হওয়ার পরিপূর্ণতা। এজন্য প্রত্যেকের ধারাবাহিক জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, মন বিবেকের ক্ষমতা অনুযায়ী একটা মানবকে নির্বাচন করবেন, যিনি আপনাকে সেই চূড়ায় বা ধারাবাহিকতা অনুযায়ী সেখানে পৌঁছানোর ক্ষমতা রাখে বা সেই শিক্ষার ট্রেনিং গুলো আপনাকে দিতে পারে।

একত্ত্ববাদের মূল ধারাতে যেতে হলে আপনাকে এই প্রাথমিক ব্যবস্থায় সমর্পণ জ্ঞাপন করতে হবে, এটার অর্থই হলো আত্মসমর্পণ। তাসাউফ বা সুফি মতাদর্শে ইসলাম শব্দের অর্থ হলো আত্মসমর্পণ। তাহলে আল্লাহ্‌কে যে দেখিনি, এই না দেখা অবস্থায় বিশ্বাস রাখতে হবে যে আল্লাহ্‌কে দেখা যায়। কেন ? আল্লাহ্‌ মানুষের মধ্যে বিরাজিত, সকল ওলি, আউলিয়া, কেরামগণ এর প্রমান দিয়ে গেছেন যে আল্লাহ্‌কে দেখা যায়। এজন্য তাঁকে দেখতে হলে একটা মানবের কাছে স্যারেন্ডার হতে হবে।

এজন্য ফকির লালন শাঁই বলেছেন:- মানুষ থুয়ে খোদা ভোজ, এই মন্ত্রণা কে দিয়েছে, মানুষ ভোজ খোদা খোঁজ কোরানের পাতায় পাতায় সাক্ষ্য আছে। তাহলেই মওলার দর্শন হবে। মানুষকে ভোজলেই সোনার মানুষ হবি। অর্থাৎ একজন মানুষ যে পরিপূর্ণতায় সফল হয়, সেটা এই ভাব ধারাতেই। এই ভাব ধারা শুধু লালন ফকির নয়, বিশেষ করে তাসাউফ ধারী সকল ওলি আওলিয়া মহা মানবগণ তাদের কিতাবে বলে গেছেন যে, একটা মানুষের কাছে তোমাকে আত্মসমর্পন করতে হবে, যদি আল্লাহ্‌কে পেতে চাও।

তাহলে এই একক, অখন্ড, অদ্বিতীয় স্বয়ংভূ সত্ত্বা। সেই সত্ত্বার মূল বিকাশিত যে ব্যবস্থা, সেই ব্যবস্থাটা প্রাথমিক ভাবে রুপক আকারে এটা জারী হয় একজন কামেল মোর্শেদের কাছে। কেন ? কারণ আপনি যদি এখন বাজার থেকে একটি ঔষধের সিরাপ কিনে আনেন সেটাও একটি প্যাকেট বা মোড়কে

ঢাকা থাকে। ঐ মোড়কের গায়ে সেই সিরাপের নামটা লেখা থাকে কিন্তু এই মোড়কের গায়ে লেখা নামটা কিন্তু আসল সিরাপ বা ঔষধ না। এটা হলো লেখা সিরাপ বা ঔষধ। আর আসল ঔষধ বা সিরাপ বের করতে হলে আপনাকে এই প্যাকেট বা মোড়ক খুলে আলাদা বা পৃথক করতে হবে। এই পৃথক করার কারণে ভিতরে একটি বোতল পাবেন, এই বোতলের ক্যাপ বা ছিঁপি খুললে আপনি সেই আসল সিরাপ বা ঔষধটা দেখতে পারবেন। সেখানেই এই আসল সিরাপ বা ঔষধের পরিমাণ, কালার, কার্যকারিতার গুনাগুণ সকল কিছু রয়েছে। সব কিছুই হলো এই ঔষধ বা সিরাপের পরিপূর্ণতা। তখন দেখবেন, নাড়াচাড়া করবেন এর কার্যকারিতায় আপনি জ্ঞাত হবেন।

ঠিক একই ভাবে মওলা বা মাবুদ সত্ত্বা আমার মধ্যে বিরাজিত। আল্লাহ্পাক বলছেন:- নাহনু আকরাবু ইলাইহে মিন হাবলিল ওয়ারিদ অর্থ আমরা তোমার শাহারগেরও নিকটে আছি। এই নিকটে যে আল্লাহ্, তাঁকে যে আমি দেখতে পারিনি, তাঁকে যে আমি বের করতে পারিনি। এই বের করতে না পারার মূল কারণ হলো আমি একা একা আমাকে পৃথক করতে শিখিনি। তাহলে এই একা একা বের করবার পৃথকীকরণ ব্যবস্থা আমার মধ্যে রাখিনি, এ কারণে একজন মোর্শেদ বা শিক্ষকের স্মরণাপন্ন হতে হয়। স্মরণাপন্ন হলে তিঁনি কিভাবে একটি মানবাত্মার মধ্য থেকে মূল সত্ত্বাকে পৃথক বা বের করতে হয়, তাঁর জাগরণ ঘটাতে হয়, তাঁর রুপ বৈচিত্রের ধারায় বান্দা কিভাবে একত্রিত হতে পারবে, এই শিক্ষাগুলো তাঁরা দিয়ে থাকেন, এটাই তাঁদের শিক্ষা, এটাই সুফিবাদের মূল আদর্শ এবং এটাই আহলে বায়াতের মূল কারিকুলাম।

আল্লাহ্পাক সুরা মমিনের ৬০ নাম্বার আয়াতে বলছেন:- ওয়া কালা রাব্বিকুম, উদউনি আস্তা জেবলাকুম। অর্থ:- তুমি একা ডাক, ডাকের সঙ্গে সঙ্গে জবাব পাবে। তাহলে আমি আমি যে বুলি ধরেছি কিন্তু আসলে আমি যে আমি না। কেন ? আমি একা হলে আল্লাহ্কে ডাকার সঙ্গে সঙ্গে জবাব পেতাম, কালাম তার সাক্ষ্য। আমি এত ডাকি আল্লাহ্ কী শুনে না ? আমার ডাকের কার্যকারিতা না পাবার কারণ কী ? এইটা কোন দিন জানলাম না বা বুঝতে চেষ্টা করলাম না। এই কার্য্যাবলির মূল কারণটা কি সেটা আমাকে জানতে হবে, এ বিষয়টা আমাকে খুঁজে বের করতে হবে।

সেই সত্ত্বা – ২৭

এজন্য অনেকেই বলে থাকেন দুনিয়াতে সবচেয়ে কঠিন কাজ হলো নিজের ভূল ধরা, আর সহজ কাজ হলো অন্যের ভূল ধরা। আমার ভূল আমি ধরতে পারিনি, আমিতো ঠিকই আছি, এটাই গেয়ে বেড়ায়। তাই একজন কামেল মোর্শেদ বা পীর বা শিক্ষকের কাছে আত্মসমর্পন করতে হবে। আত্মসমর্পন করলে আমাকে আমি কিভাবে বিভাজন করব, সেই বিভাজন প্রক্রিয়া হলো:- আমি কী ? আমি দেহধারী। আমার দেহের মধ্যে কি কি সন্নিবেশিত রয়েছে সেইটা সম্পর্কে আপনাদের একটু অবগত করি। সেটা হলো এই আমি হলাম নফ্স, নফ্সধারী এই দেহ। নফ্স জন্ম নেয় এবং সাধরণত এটা ধীরে ধীরে ক্রমান্বয়ে প্রবৃদ্ধি হয় এবং প্রবৃদ্ধি হতে হতে বার্ধক্যে উপন্নিত হয়ে নফ্স মৃত্যুতে সমাসীন হয়। শুধু আমরা মানুষেরই নফ্স আছে তা নয়।

আল্লাহ্পাক সুরা আমব্বিয়ার ৩৫ নাম্বার আয়াতের প্রথমাংশে এক বাক্যে সবাইকে বলে দিয়েছেন: কূল্লু নাফ্সিন যায়িকাতুল মাউত। অর্থ:- প্রত্যেক নফ্স মৃত্যুর স্বাদ গ্রহন করবে। অর্থাৎ নফ্সধারী হলেই তাকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহন করতে হবে। তাহলে আমার মধ্যে নফ্স আছে, আমার জন্ম হয়েছে এবং আমাকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহন করতে হবে।

আমার মধ্যে আর কী রয়েছে ? আমার মধ্যে মন্দ সত্ত্বা বা শয়তানি সত্ত্বা রয়েছে। কালামপাকে আল্লাহ্পাক শয়তানের চারটি রুপের বর্ণনা করেছেন, তারা আমার মধ্যে বিরাজিত। সেগুলো হলো:-

১) শয়তান।
২) ইবলিশ।
৩) মরদুদ ।
৪) খান্নাস।

তারা আমারই ভিতরে কিন্ত তাদেরকে আমি দেখি না। এই একত্ত্ববাদে একটি দেহকে জাগরণ ঘটাতে হলে, এই শয়তানি সত্ত্বা বা মন্দ সত্ত্বা:- শয়তান, ইবলিশ, মরদুদ, খান্নাস এই চারটি সত্ত্বাকে দেহ হতে দুরিভূত করতে হবে বা মুক্ত করতে হবে। অথবা এই চারটি সত্ত্বার অবয়বের জাগরণ ঘটিয়ে কলেমা পড়িয়ে এদেরকে মুসলমান করতে হবে। এটাই হলো পূর্ণতার অবয়বের মুসলিম।

সেই সত্ত্বা – ২৮

সৎকর্মের বাঁধাসমুহ বা শয়তানের মন্দ কর্মগুলি উল্লেখ রাখলাম আপনাদের সুবিধার্থে ঃ-

(১) উদ্দিল লানা – পথহারা করা।

(২) উমান নিয়াননা – মিথ্যা কামনা বাসনা তুলে ধরা।

(৩) ইয়ানজাগাননা – কুমন্ত্রণা দেওয়া।

(৪) নাজাগুন – প্ররোচিত করে।

(৫) আদাওয়াতা – শত্রুতা।

(৬) বাগদাআ – ঘৃণা।

(৭) আসিয়্যা – অবাধ্য।

(৮) আজনান – বিপথগামী করে।

(৯) মারেদিন – বিতাড়িত বিদ্রোহী।

(১০) ওয়াস ওয়াসা – কুমন্ত্রণা দেয়।

(১১) ইয়াফতি নাননা – প্রলুব্ধ করে।

(১২) তামাননা আলকা– নিক্ষেপ করে কামনা বাসনা।

(১৩) উলকি ফেতনাতান – ফেতনা নিক্ষেপ করে।

(১৪) ইয়া এদুকুমুল ফাকারা – দারিদ্রতার দিকে ফিরিয়ে দেয়।

(১৫) ইয়া মুরুকুম বিল ফাহসায়ে – তোমাকে হুকুম করে ফাহেসার সাথে।

(১৬) ইয়াদউ আস্ হাবিস সাইর - প্রজ্জ্বলিত আগুনের অধিবাসী হবার জন্য ডাকে।

(১৭) কাইদা – চক্রান্ত করে।

(১৮) ইয়ান জাগু – একের উপর অন্যকে লেলিয়ে দেয়।

(১৯) হামাজাত– পরনিন্দা, প্ররোচনা, খোঁচামারা, গীবত করা।

শয়তানের এই উনিশ প্রকারের মন্দ কর্ম সম্পর্কে আপনাদের অবগত করলাম। এর থেকে দূরে থাকতে চেষ্টা করবেন।

আমার মধ্যে আর কী আছে ? ঐ আয়াতে কারিমায় বর্ণনা করলাম:- নাহনু আকরাবু ইলাইহে মিন হাবলিল ওয়ারিদ। অর্থ:- আমরা তোমার শাহারগেরও নিকটে আছি। অপর একটি আয়াতে আল্লাহ্পাক বলেছেন:- ওয়াফি আনফুসি কুম ওয়ালা তাফসিরুন। অর্থ:- আমি তোমার নফ্সেও মিশে আছি তুমি তা দেখ না। দেখলে তো কাজ হয়েই গেল। আল্লাহ্পাক বলছেন ডাকার সঙ্গে সঙ্গে তিঁনি জবাব দেন। তাহলে এই তিনটি স্তরে সমাসীন এই দেহ, আর এজন্য এই দেহটা আশরাফুল মাখলুকাতে ভূষিত। তাই এই সৃষ্টির সেরা হলো মানুষ। আল্লাহ্ সত্ত্বা এবং শয়তানি এই দুইটি সত্ত্বা একত্রে মানুষ এবং জ্বীন ব্যতিত অন্য কাউকে দেওয়া হয় নি।

মানুষ এবং জ্বীন ব্যতিত সকল কিছু তৌহিদ রাজ্যে বসবাস করে। যেটা এই একত্ত্ববাদের সুরাতে এসেছে। একটি গাছ আপনি মনে চাইলে এখনি কেঁটে ফেলতে পারেন, কেঁটে ফেললে তার মৃত্যু হয়ে যাবে। তৌহিদ রাজ্য এমন অর্থাৎ তার কোন প্রতিবাদ থাকে না। কোরান বলছে:- গাছ, বৃক্ষ, তরুলতা তৌহিদ রাজ্যের সকল কিছু আল্লাহ্র জিকিরে মশগুল থাকে। কোন দিন গাছের কাছে এসে তো শুনতে পেলাম না। কি দিয়ে শুনব ? কারণ আমি শয়তান, মরদুদ, ইবলিশ, খান্নাস মন্দ সত্ত্বা দ্বারা পরিচালিত। যার কারণে কোন কথায় আমার কর্ণে প্রবেশ করে না বা আমি শুনতে পাই না। এগুলোকে যদি আমি বিতাড়িত করতে পারতাম বা এদের যদি আমি মুসলিম করতে পারতাম, তাহলে আমি মূল সত্ত্বায় মিশতে পারতাম, আর কালামের যা কিছু বর্ণনা রয়েছে সে সম্পর্কে অবগত বা দৃষ্টিগোচর হত। এগুলো আমি নিজ কর্ণে শুনতে এবং নিজ দৃষ্টিতে দেখতে পেতাম। তাই আমার এই দুর্ভাগ্য, এই মানব জনম নিয়ে আমার আফসোস হয়। তাহলে অখন্ড অর্থাৎ এর কোন খন্ডন নেই, বিভাজনকৃত ব্যবস্থা নেই, সেই অখন্ড ব্যবস্থার মধ্যে নিজেকে আসবার জন্য এই মন্দ সত্ত্বাকে এই নফ্সধারী আত্মা থেকে কিভাবে বিতাড়িত করতে হয়, এটাই হলো আহাদের মূল অনুপ্রাণিত ব্যবস্থা।

যদি কোন বান্দা তার ভিতর থেকে এই চারটি সত্ত্বা: শয়তান, ইবলিশ, মরদুদ, খান্নাসকে যদি কেউ বিতাড়িত করতে পারে বা এদের যদি কলেমা পড়িয়ে মুসলিম করতে পারেন, তাহলেই সেই সত্ত্বাটাই আহাদ সত্ত্বা হয়ে যায়।

এজন্য কোন এক সুফি গবেষক বলেছেন, আহাদ আল্লাহ্ হলো দূর্বল আল্লাহ্। কেন ? কারণ এটা হলো প্রাথমিক স্তর। যে কোন মানব সাধনার দ্বারা, তার ক্রিয়াকলাপ বা অনুশীলনগামী ব্যবস্থার দ্বারা সে এই স্তরে উন্নিত হতে পারে।

ওলি, মাশায়েখগণের যে মতাদর্শ বা সুফিদের যে কারিকুলাম, সেটা এই আহাদ সত্ত্বারই জাগরণ ঘটানো। মূল সত্ত্বা সেখানেই সমাসীন, কিন্তু এটা রুপান্তরিত যে প্রতিটি মানবের মধ্যে আল্লাহ্ সত্ত্বা বিরাজিত, এই সত্ত্বাকেই দেখে থাকেন ওলিরা। এটাই হলো আল্লাহ্ সত্ত্বার কারিকুলাম। এটারই এই ট্রেন্ডেন্সি, এটারই বাহাদুরি ওলিদের। কারণ এই জালুয়াতে একটি মানবের স্থীর থাকা খুব কঠিন হয়ে যায়। কারণ এটা একটি বিভাজনকৃত ব্যবস্থা কিন্তু মূল ধারাতে এটা প্রতিটি মানুষের মধ্যে সন্নিকটে দেওয়া রয়েছে। এত নিকটে দেওয়া রয়েছে তবুও সেখান থেকে আমরা মূল সত্ত্বার উৎগীরণের পথে হাঁটতে পারলাম না, এই আফসোস।

ধর্মের কি শিখবেন ? যে আল্লাহ্ বলছেন ডাকের সঙ্গে সঙ্গে জবাব পাবে। এত কিছু চাই আল্লাহ্র কাছে, এত কালাম তেলোয়াত করি কিন্তু কোনটাই কার্যকারিতা পায় না। কেন ? আসলে গোঁড়া বা মূল তো কাঁটা রয়েছে, শিঁকড় যদি মোট কাটা থাকে, ঐ গাছে যতই পানি ঢালেন গাছ তো বাঁচবে না। কারণ কালাম নির্দেশ দিয়েছে একা ডাকো কিন্তু আমি যে ঐ তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে ডাকি। তাই আল্লাহ্ এই ডাকের জবাব দেন না। আবার এই কথাগুলো জাগতিক ভাবে বলাও হয় না। যদি জাগতিক ভাবে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় বলা থাকতো, তাহলে মানুষ জন্ম লাভের পর থেকে এই অনুশীলনগামী ব্যবস্থার দিকে তরান্বিত হত। যদিও এগুলো কেউ বলে থাকে তাদেরকে অবাঞ্চিত বলে গণ্য করা হয় এবং তাদেরকে কিভাবে বিতাড়িত করা যায় সেই সকল কাজে তারা লিপ্ত হয় এবং হত্যার চেষ্টা পর্যন্ত করতে কুণ্ঠাবোধ করে না, সেই যুগের আবু জাহেলের মত। সত্য বললে যাদের মিথ্যার আশ্রিত ব্যবসা-বাণিজ্য, তাদের আর ব্যবসা থাকে না। মন্দের দৃষ্টিতে ভালোও মন্দ হয়ে যায়। সত্য কথা হলো এমন। সত্য নিভু নিভু আলোতে জ্বললেও এটা সবার কাছে পৌঁছে যায়। গ্রহন করা বা না করা বান্দার ইচ্ছা।

তাহলে সুরা ইখলাসের প্রথম আয়াতে আল্লাহ্পাক বললেন:- কূলহু আল্লাহু আহাদ। অর্থ:- বলো আল্লাহ্ একক। তাহলে একক সত্ত্বা হলো প্রতিটি মানুষের

মধ্যে আল্লাহ্ একক রুপে বিরাজিত রয়েছেন। অর্থাৎ আমার ভিতরে যে আল্লাহ্ রয়েছে সেটার যে রুপ বা সেটা যে রকম, আপনার মধ্যে রয়েছে সেটাও সেই একই রকম। তাহলে প্রতিটি মানুষের মধ্যে একই রকম সত্ত্বা বিরাজিত। এই একক সত্ত্বা হলো এমন। এই একক সত্ত্বা জাগরিত করতে হলে একজন পীর বা মোর্শেদ আমাদের ধরতে হবে এটা আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারলাম।

এর পরের আয়াতে বলা হলো:- আল্লাহুস সামাদ। অর্থ:- তিঁনি মহা নিরপেক্ষ। এই মহা নিরপেক্ষ হলো দ্বিতীয় শক্তিশালী আল্লাহ্। এই নিরপেক্ষতা কি দিয়ে হয় ? নিরপেক্ষতার বলয় হলো:- একটি মানবের মধ্যে যখন শয়তানি সত্ত্বা দুরিভূত হয় বা শয়তান ইবলিশ মরদুদ খান্নাস এই চারটি সত্তা যখন দুরিভূত হয় তখন পূর্ণ আহাদ সত্ত্বা বিরাজিত হয়। তখন দ্বৈত সত্ত্বার জাগরণের মিলনে এই আহাদ সত্ত্বা সর্ব মানবের কল্যাণে কাজ করার জন্য সে গোটা দুনিয়াতে বা ধরাধামে সে বিচরণ করে। সেই কার্যাবলি সম্পর্কে সে পরিজ্ঞাত হয়। সাধক তখন বুঝতে পারে তখনই তাঁর মধ্যে এই দ্বিতীয় অবয়ব বা সামাদ সত্ত্বা জারী হয়। এটা কার মধ্যে ? এটা মানুষের মধ্যে হয়, তাই মানুষের বিকশিত রুপ হলো এই আহাদ সত্ত্বায় উন্নিত রুপ বা পরবর্তী স্তর বিন্যাস, সেই বিন্যাসটাই হলো সামাদ। তাই সামাদ হলো মহা নিরপেক্ষ।

কারণ আহাদ সত্ত্বায় একজন বান্দা যখন পরিপূর্ণতা পায়, এই পরিপূর্ণতা পেলেই তো তাঁর পরিতৃপ্তি হয়। তাহলে তাঁর সাথে আল্লাহ্র মোলাকাতের একটি ব্যবস্থা রয়েছে বা তাঁর সঙ্গে আল্লাহ্র কথোপ-কথনের ব্যবস্থা রয়েছে। সকল কার্যক্রম তাঁর কার্য্যাবলির সঙ্গে যে একটি নিরপেক্ষতার অবয়ব, সেটা এই কার্যকারিতার রুপে দাঁড় করবার জন্য আরও অনুশীলনগামী ব্যবস্থার দিকে পরিগণিত হতে হয়। সেই পরিগণিত হতে হতে একটি নিরপেক্ষতার বলয়ে এসে দাঁড় করায়।

এজন্য আমার মোর্শেদ কেবলা-কাবা উঁনি বলেছেন, সুফি মতাদর্শে রাজনীতি হারাম। যদিও কেউ করে থাকে সেটা তার ব্যক্তি কেন্দ্রিক কার্যাবলী। কিন্তু আসলে সুফির যে মানদন্ড বা সুফির যে কারিকুলাম সেই কারিকুলাম যদি কেউ এ্যানালাইসিস করে বা তার হৃদয়ে সেই সংবিধানকে লালন করে, তাহলে সে রাজনীতির সাথে যুক্ত হতে পারবে না। কেন ? তার একমাত্র লক্ষ্যটাই তো সে স্থীর করে লেগেছে।

তাহলে তার দ্বিতীয় বা অন্য কোন লক্ষ্যের দিকে সে কিভাবে যায় ? এজন্য সেই নিরপেক্ষতার অবয়বে বলা রয়েছেঃ- আল্লাহ্ মহা নিরপেক্ষ। সেই মহা নিরপেক্ষতার অবয়বে একটি বান্দা তার কারিকুলাম এবং কার্য্যাবলী দ্বারা সেই স্তরে পৌঁছালে, সেই বান্দাটাও সামাদ বা মহা নিরপেক্ষ হয়ে যায়। এখন আমরা অনেকেই আল্লাহ্র নামের সাথে নাম সংযুক্ত করে রেখে থাকি। যেমনঃ- আহাদ, সামাদ, রাজ্জাক, কুদ্দুস, রহিম, রহ্মান ইত্যাদি। আমাদের সমাজে অনেকেরই নাম সামাদ রেখেছেন। এই সামাদকে যদি আপনি গালি দেন তখন কিন্তু এইটা আল্লাহ্পাকের সেই সামাদে লেগে যায়। শুধু ভাল নাম রাখলেই হবে না, আপনার সন্তানকে সেই ভাল নামের কার্যকারিতা বা তার নামের সুফলকে ফলানোর জন্য তাগিদ করতে হবে। আল্লাহ্র নামের সঙ্গের তাঁর যে গুণাবলি, সেই গুণাবলিতে বিকাশিত হবার যে রাস্তা, সেই রাস্তাতে তাকে অনুপ্রাণিত করতে হয়। তবেই সেই নামের স্বার্থকতা থাকে এবং আল্লাহ্ খুশি হন, যে আমার বান্দা আমার নামকে নিয়ে সেই নামের পরিপূর্ণতার অবগহনে সিক্ত হতে পেরেছে। শুধু নাম রেখে দিলে সেটা ঐ ঔষধের বা সিরাপের প্যাকেট বা মোড়কের মত হয়ে যাবে। এটা তখন শুধু রাখা নামই হয়ে থাকবে, আপনারা নিশ্চই বুঝতে পারছেন।

তাহলে আল্লাহুস সামাদ। অর্থঃ- তিঁনি মহা নিরপেক্ষ। এখন এই নিরপেক্ষতা সম্পর্কে যদি নিশ্চিত হয়ে যায়, তাহলে আল্লাহ্ কোন দোষের মধ্যে নেই। আমাদের যদি কোন বিপদ বঞ্চনা আসে তাহলে আমাদের ধৈর্য্যের ত্রুটি ঘটে যায়। অর্থাৎ ধৈর্য্য হারা হয়ে যাই। আল্লাহ্কে দোষারোপ করে ফেলি অর্থাৎ অনেকেই এভাবে বলে থাকেন যেঃ- আল্লাহ্ আমাদেরকে একটি সন্তান দান করেছিল তার সময় হয়েছে সে নিয়ে গেছে, তাহলে দোষটা কার ? দোষটা আল্লাহ্র হয়ে গেল না ? কিন্তু আল্লাহ্তো কোন দোষের ভাগই নেয় না। আল্লাহ্ বলছেন যে, আল্লাহুস সামাদ। অর্থঃ- তিঁনি মহা নিরপেক্ষ। তাহলে নিরপেক্ষ যদি হয় এই দোষটা কার ? একটি শিশু যদি মারা যায় তাহলে শিশুতো নিষ্পাপ, যার কোন পাপই হয় নাই। তাহলে সে মারা গেল এর কারণ কি ? তাহলে এই কথা গুলো যদি আমরা বুঝতে চাই, তাহলে পুণর্জন্মবাদ একটা ব্যবস্থা জারী হয়ে যায়। এই পুণর্জন্মবাদ হলো জাগতিক শরিয়তের বিধানে এখানে এটাকে স্থান দেওয়া হয় নি, এটাই সমস্যা।

তাহলে এই আল্লাহুস সামাদ বা আল্লাহ্ মহা নিরপেক্ষ সম্পর্কে যদি আমরা আরেকটু বুঝতে চাই। সেটা হলো:- সমগ্র সৃষ্টি রাজ্যে আল্লাহ্র অবস্থান সম্পর্কে তিনটি স্তর বিন্যাস বর্ণনা রয়েছে, তার মধ্যে প্রথম অবস্থান হলো আহাদ আল্লাহ্। এই আহাদ আল্লাহ্ হলো দূর্বল আল্লাহ্। দ্বিতীয় স্তর হলো এই সামাদ আল্লাহ্, অর্থাৎ নিরপেক্ষ আল্লাহ্, এই নিরপেক্ষ আল্লাহ্ হলো আল্লাহ্র দ্বিতীয় স্তর। আরেকটি স্তর রয়েছে সেটা যদিও এই সুরায় আসে নি, সেটা হলো লা স্তর। অর্থাৎ একটি বান্দা আল্লাহ্র সঙ্গে পূর্ণ মিলনের যে বিন্যাসকৃত ব্যবস্থা, সেই বিন্যাসকৃত ব্যবস্থায় লা শরীকআলার রুপ হলো এই লা। এই লা হলো আল্লাহ্র শক্তিশালী স্তর, সে স্তরে কলেমা সৃজিত হয়েছে। এটাই হলো আধ্যাত্মবাদের ধারা।

তাহলে আল্লাহ্র তিনটি স্তর। প্রাথমিক স্তরে ওলিরা যে আল্লাহ্র দর্শন লাভ করে থাকে, সেটা হলো আহাদ রুপে আল্লাহ্র দর্শন লাভ হয়। দ্বিতীয় স্তর হলো নিরপেক্ষ আল্লাহ্। এই নিরপেক্ষ আল্লাহ্ হলো শক্তিশালী আল্লাহ্। অর্থাৎ এই নিরপেক্ষ শক্তিশালী আল্লাহ্ হলো যিনি কোন পক্ষ অবলম্বন করেন না। অর্থাৎ আহাদ আল্লাহ্ থেকে স্থানান্তরিত হয়ে সে যদি আরও গভীরে অগ্রসর হয়, তাহলে তাঁর শক্তি, ক্ষমতা, সামর্থ্য অনুযায়ী দ্বিতীয় আল্লাহ্র স্তরের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল হয়। এই সামঞ্জস্যশীল হবার কারণে আল্লাহ্র এই স্থানান্তরিত ব্যবস্থাটাও রুপান্তর হয়ে যায়। তাহলে এই রুপান্তর হতে হলে সাধককে তখন বার বার নিরপেক্ষতার বলয়কে প্রমাণ করতে হয়। অর্থাৎ এটা এত সহজ ভাবে হয় না। মোরাকাবা মোশাহেদার মাধ্যমে সৃজনকৃত যে ব্যবস্থা, সেই ব্যবস্থায় গেলেই যে এটা হয়ে যাবে তা নয়।

প্রাথমিক দর্শনে গিয়ে তাকে যে গতিতে বার বার পরীক্ষা নিরীক্ষায় উপন্নিত হতে হয়, যে পরীক্ষার মধ্যে বান্দার পক্ষপাতিত্বের কোন অবকাশ নেই বা লেস নেই। সেটাকেই বার বার প্রমাণ করতে বা মেলে ধরতে বান্দার প্রচেস্টা করতে হয়, আর সেটা যদি আল্লাহ্র কাছে গৃহিত হয় তখন সেটা কার্যকারিতা পায়। এই প্রকৃতির যত ওলি আওলিয়া রয়েছে বেশির ভাগ জগতের মধ্যে মাজ্জুব হালে তাঁরা থাকেন অর্থাৎ পাগলের হালে থাকেন। এই পাগলের হালে সামাদ রুপে তাঁরা থাকেন। আমরা হয়ত আমাদের সামাজিক বা জাগতিক দৃষ্টিতে এটা বুঝিনা বা এটার দর্শন পাই না।

কিন্তু আসলে তাঁরা আল্লাহ্‌র কর্মের মধ্যেই নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। কারণ পাগল আর উন্মাৎ যদি সে না হয় তাহলে তার কোন না কোন পক্ষ থেকেই যায়। একটি ছোট বাচ্চার প্রতি যদি তাঁর ভালবাসা থাকে তাহলে সেই বাচ্চার পক্ষের দিকে সে চলে যেতে পারে। তাহলে এটা একটি আমল বা আকিদা, যার উপর নিজেকে স্থীর রাখা বা কার্যকারিতা করা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে যায়। এজন্য সাধকগন নিজের স্ব-ইচ্ছায় মাজ্জুব হালটাকে বেছে নেয়, যে আমি এই স্তরকে অন্তত দুনিয়ার জমিনের যে কয় দিন আমার হায়াতের জিন্দিগি থাকে, সেই সময়টা এই কার্য্যের মধ্যে চূড়ান্ত ভাবে আকড়ে ধরে রাখতে পারি। সেটাই তাঁর সাধনার মূল কার্য্য।

এজন্য আয়াতে কারিমায় বলা হয়েছেঃ- আল্লাহুস সামাদ। অর্থ আল্লাহ্‌ মহা নিরপেক্ষ। তাহলে এই আহাদ আল্লাহ্‌ থেকে রুপান্তর হয়ে দ্বিতীয় স্তরে আসে সামাদ। তাহলে এই সামাদ আসলে নিরপেক্ষতা। এজন্য প্রতিটি মানুষের আকিদাতে শুরুতেই বলা হলো তুমি নিরপেক্ষতা অবলম্বন কর। তাহলে শুধু এই আকিদাটুকু থাকলে হবে না এটার কার্যকারিতা বা যথার্থতার রুপ ফলপ্রসূ করতে হবে। এটা হলো সুফি দর্শনের উদ্ভাসনকৃত একটি ব্যবস্থা। সেই উদ্ভাসনকৃত ব্যবস্থা যদি তরান্বিত বা কার্য্যকারিতা পায়, তাহলেই এটা ফলপ্রসূ হবে। নিরপেক্ষতার অর্থ হলোঃ মা-বাবা, ছেলেমেয়ে, বিবি বা রক্তের বন্ধন বলতে যা কিছু বোঝা যায় সকল কিছুকে পরিত্যাগ করতে হবে। কেন ? কারণ আপনার একমাত্র লক্ষ্য তো আপনি মনোরাজ্যে স্থীর করেছেন। এই স্থীর করলে এর প্র্যাকটিক্যাল ব্যবস্থাটা এখানে এসে দাঁড়ায়। কারণ এটা যদি প্র্যাকটিক্যাল কার্য্যাবলিতে আপনি প্রমাণিত না হন, যার কারণে আল্লাহ্‌পাক আগেই ব্যবস্থা পত্র দেন নি যে, অমুক জায়গায় গেলে আল্লাহ্‌কে পাওয়া যাবে।

যদি মক্কাতে গেলে আল্লাহ্‌কে পাওয়া যেত তাহলে মানুষের যা কিছু আছে সব ফেলে সমস্ত মুসলিম উম্মাহ ওখানে গিয়ে সমাসীন থাকত। কিন্তু ওখানেও আল্লাহ্‌ নেই, ওটা একটি রুপক ব্যবস্থা রাখা রয়েছে। ধর্মীয় অনুশাসনে প্রত্যেক বিষয়ে দুইটি দিক রয়েছে, একটি রুপক অপরটি আসল। কারণ রুপক না থাকলে আসলের অস্তিত্ব থাকে না। এজন্য রুপক দিয়ে আসলকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কিন্তু আসল-আসলকেই খুঁজে বের করবে এটাই মানুষের স্পৃহা। এজন্য আমাদেরকে মানুষ রুপে সৃষ্টি করা হয়েছে।

এই দুইটি মাখলুককে আল্লাহ্ এই স্বাধীন সত্ত্বা দান করেছেন, এক হলো মানুষ অপরটি জ্বীন। তারা ইচ্ছা করলে আল্লাহ্কে মানতেও পারে আবার না ও মানতে পারে। এদেরকেই স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে আর কারো কিন্তু স্বাধীনতা নেই। এই কারণে আবার শাস্তির ব্যবস্থাটাও রাখা রয়েছে। যদি শাস্তির ব্যবস্থা আর স্বাধীনতাটুকু না থাকত, তাহলে আমরা কেউ উল্টা পাল্টা হতাম না। কারণ আল্লাহ্পাক কালামপাকে বলছেন, তোমাকে পরীক্ষা স্বরুপ দুয়িাতে প্রেরণ করা হয়েছে। তাহলে আমি আপনি সবাই পরীক্ষার জন্য দুনিয়াতে এসেছি। কি পরীক্ষা ? তার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য তাঁর কালাম পাকে বা সংবিধানে বলে দিয়েছেন। তাহলে সেই সংবিধানের আলোকে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য অনুশীলনগামী ব্যবস্থায় পরিচালনা করলাম, না কি এই মোহ গ্রস্থতার দিকে নিজেকে নিয়োজিত করলাম ?

যে যেটা করবে সে সেটার ফল পাবে। কোরানুল মাজিদে সুরা নজমের ৩৯ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ্পাক বলেছেনঃ- এবং মানুষ তাহাই পায় যাহা সে করে, অপর সুরা আশ-শুরার ৩০ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ্পাক বলেছেনঃ- তোমাদের উপর যে সব বিপদ-আপদ পতিত হয়, তা তোমাদেরই কর্মেরই ফল এবং তিঁনি তোমাদের অনেক গুনাহ ক্ষমা করে দেন। এজন্য আল্লাহ্পাক বলছেন তিঁনি মহা নিরপেক্ষ। কেন ? কারণ বান্দা বা আমি যা করব সেই অনুযায়ী আমার ব্যবস্থা। আমি যদি মন্দ করি এবং আপনাদের কাছে ভাল সাজি বা ভাল কথা বলি তাহলে এর শাস্তি আমাকেই নিতে হবে। এক জার্রা পরিমাণ আল্লাহ্পাক পারসিয়ালটি করবেন না। অর্থাৎ আমার কর্মফল আমাকেই দেওয়া হবে বা আমাকে ভোগ করতে হবে। আমি যা প্রাপ্ত হব তাই আমাকে দেওয়া হবে। তাই প্রত্যেক মানুষ এবং জ্বীনের জন্য স্বাধীন সত্ত্বা রাখা হয়েছে। এই জাগতিক ব্যবস্থা দিয়ে এটা বোঝাতে চেষ্টা করলাম। আধ্যাত্মিকতার বলয় পুস্তকে মুক্ত ভাবে যদিও প্রকাশ করা যায় না তার পরেও একটু ধারণা দেওয়ার চেষ্টা রেখেছি। যেহেতু আমরা সুফি মতাদর্শের উপর পরিচালিত। তাই মূল ধারার কথাগুলো একটু বলার চেষ্টা করলাম, বলা রয়েছে জ্ঞানীর জন্য ইশারাই যথেষ্ট। জ্ঞানীগণ এভাবে বলছেন এবং রাসুল (সঃ) বলছেন, তোমরা জ্ঞানের পরিমাপ বুঝে কথা বল। অর্থাৎ সকল জায়গায় সব কথা বলার আইন নেই।

বোখারী শরীফে আবু হোরায়রার বর্ণনা এসেছে যে, আমি রাসুল (সঃ) এর কাছ থেকে দুই প্রকারের জ্ঞান সংগ্রহ করেছি। একটা প্রকাশ করে গেলাম, আরেকটা প্রকাশ করলে আমার খাদ্যনালী কর্তন করা হত। তাহলে সে শিক্ষাটাও তো আছে, যা প্রকাশিত হলে খাদ্যনালী কর্তন করা হয়। সে শিক্ষাটাও কোনও না কোন মাধ্যম অনুযায়ী দেওয়া হয় বা সেই স্তরে পৌঁছলে সে জানতে পারে বা বুঝতে পারে।

তাহলে আল্লাহ্ মহা নিরপেক্ষ। তিঁনি কারো সাথে পারসিয়ালটি করেন না, সেই প্রক্রিয়াটাই এই একত্ত্ববাদের মধ্যে বলা রয়েছে সেটা হলো:- আল্লাহুস সামাদ। অর্থ:- তিঁনি মহা নিরপেক্ষ। অর্থাৎ আল্লাহ্ কারো প্রতি ইনজাস্ট্রিস করবেন না। এই আয়াতে কালামের মূল ধারা যদি আলোচনা করা হয় তাহলে জন্মান্তরবাদ এসে যায়। যদিও এটা জাগতিক ভাবে শরিয়তিতে রাখা নেই, যার কারণে বিতর্কিত একটি অধ্যায়। কারণ মহা নিরপেক্ষতার কর্ম অনুযায়ী যদি ফল হয় তাহলে পুনর্জন্মবাদ বা রুপান্তরবাদে হয়ে যাচ্ছে। স্রষ্টা থেকে আমাদের আবির্ভাব এবং স্রষ্টাতেই লীন বা পৌঁছানো। তাহলে যা করব সেই অনুযায়ী ব্যবস্থাপত্র। এটা অবারিত ভাবে চলমান তা না হলে বেশি বা কম হয় কী করে ? কনোস্টেন্ট বা স্থীর থাকত। যে রকম সূর্য্য এক, চন্দ্র এক কিন্তু মানুষ এ রকম কনোস্টেন্ট নেই, প্রবৃদ্ধি আছে। তাহলে এটা হলো সুক্ষ্ম জগতের বস্তু, এটা বিতর্কিত হয়, জাগতিক ভাবে যার কোন সুনির্দিষ্ট কাঠামো বা সংবিধান অনুযায়ী দলিল প্রণিত হয় না। কিন্তু ভাববাদী ব্যবস্থায় যারা এটাকে অনুশীলনগামী ব্যবস্থার মাধ্যম দিয়ে জ্ঞাত হয়েছে, তাঁরা এ বিষয়ে ফায়সালাটা দিতে পারেন।

এজন্য অনেক ওলি মাশায়েখগণের কিতাবে জন্মান্তরবাদের বিষয়গুলো সুন্দর ভাবে পরিলক্ষিত হয়। তাঁরাও আয়াতের ভাববাদী ব্যবস্থা অনুযায়ী এ বিষয়ে দলিলগুলো রেখেছেন কিন্তু মানা আর না মানা জাগতিক একটি বিষয় তো থাকেই। যার জন্য সবারই একটি শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে। সেই কারণে আমরা বিতর্কিত ব্যবস্থার আলোচনা না করাই শ্রেয় মনে করি। যদি কারো জানার ইচ্ছা থাকে তাহলে তার সঙ্গে সেটা পারসোনাল ভাবে আলাপ করাই সমীচিন বলে মনে করি।

তাহলে এই যে নিরপেক্ষতা, এই নিরপেক্ষতাই হলো একক সত্ত্বাকে উপলব্ধি করবার দ্বিতীয় স্তর। তাহলে এই মানুষের ধর্মের যিনি সৃষ্টিকর্তা বা বিধানদাতা, পালনকর্তা, আল্লাহ্ বা মাবুদ যাই বলি না কেন, উঁনি যদি দিয়ে থাকেন, তাহলে উঁনার সেই আদর্শ গরিমা নিজের মধ্যে প্রতিস্থাপিত করবার অনুশালীন গামী ব্যবস্থাটাই তো আমরা মোর্শেদ প্রদত্ত ব্যবস্থায় পেঁয়ে থাকি। তাহলে পীর বা মোর্শেদ কি শিক্ষা দেয় ? নির্জনে নিরব নিস্তব্ধভাবে যে সকল মোরাকাবা মোশাহেদা গুলো করা হয়, সেই মোরাকাবা মোশাহেদার মাধ্যমে একটি মানুষের মধ্যে যে অবাঞ্চিত মুর্তি বা মন্দ সত্ত্বা বিরাজিত রয়েছে, সেই সকল মুর্তিকে বা মন্দ সত্ত্বাকে ধ্বংস করে আপন সত্ত্বাকে জাগ্রত করতে হয়। আপন সত্ত্বাকে জাগ্রত করবার যে ব্যবস্থা, সেই পথ অবলম্বন করবার যে সূচনা বা সিঁড়ীর সেটা একটি নিরপেক্ষতার বলয়। আর এ সকল শিক্ষাগুলো পীর বা মোর্শেদ অর্থাৎ আহলে বায়াতের বংশ বা নূরের বংশ ধরেরা দিয়ে থাকেন। যদি কারো পক্ষপাতিত্ব অবল্বন করা হয়, অবশ্য মোর্শেদ বা পীর ব্যতিত, কারণ হলো তিঁনিই তো আমার ধারাবাহিক একটি প্রণালিতে আমাকে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। তাহলে নিরপেক্ষতার যে অবয়ব সেটাই হলো এই মোরাকাবার মোশাহেদার চূড়ান্ত অবয়ব। যদি আমার এটা, আমার ওটা, আমার সেটা, আমি এটা, আমার অমুক এমন ভাবখানা এসে যায়, তাহলে পরিপূর্ণতার বিকাশে কেউ পৌঁছাতে পারে না। এজন্য মোরাকাবা মোশাহেদা হলো একক কতৃত্ব, যেটা আমি অবশ্য অনেক সময় বলে থাকি যে সাধন আর ভজন দুইটা দুই জিনিস। কারণ মোর্শেদ প্রদত্ত যে ব্যবস্থা, সেই ব্যবস্থার দিকে নিজেকে যদি নিয়োজিত করা হয়, তাহলে সেই ব্যবস্থার মধ্যে নিজেকে সন্নিবেশিত করার পর, আপন-আপন উদ্ভাসিত যে রুপ, সেই রুপটাতো মোর্শেদ প্রদত্ত রুপ থেকেই এই রুপের বিভাজন হয়। এই রুপটা তো গুরু বা মোর্শেদ প্রদত্ত ব্যবস্থায়। এজন্য তরিকাতে মোজাদ্দেদে আল-ফেসানী সিরহিন্দ (রহঃ) এর মকতুবাত শরীফে বলছেন যে:- পীরে তাস্ত আওয়াল মাবুদ তাস্ত। অর্থ:- তোমার পীরই তোমার প্রথম মাবুদ। এখানে শেষ বা চূড়ান্ত মাবুদ বলেন নি। এইটা হলো কল্পনার মাবুদ। তাহলে এই কিতাবে উঁনি বলছেন পীরই হলো তোমার প্রথম মাবুদ। অর্থাৎ এই মাবুদকে আমি কল্পনা করি এটা প্রকাশিত হলে শিরক হয়ে যায়, এটার প্রকাশিত হলে বেদাত হয়ে যায়। এজন্য এটা ব্যক্তি কেন্দ্রিক একটি উপমা দেওয়া হয়েছে। কেন ? কারণ এই মাবুদকে দিয়ে আসল মাবুদের সন্ধান লাভ করতে হবে।

তাহলে এই মাবুদকে আমি কল্পনার রাজ্যে বা মনোরাজ্যে স্থান দিয়েছি। তাহলে এই মাবুদের স্থানান্তরিত ব্যবস্থাকে রুপান্তর করে এই আয়াতে কারিমার তাৎপর্য্য নিজের মধ্যে উদ্ভাসন না হওয়া পর্যন্ত এই সাধনা চলমান অর্থাৎ এই সাধনা চালিয়ে যেতে হবে। যদি এটার পরিস্ফুটন ঘটে তাহলে এই সাধনায় সফল হয়েছে। তখনই বোঝা যায় যে:- আল্লাহুস সামাদ। অর্থ:- তিঁনি মহা নিরপেক্ষ। কারো সাথে তিঁনি পারসিয়ালটি করেন না। এটাই এই নিরপেক্ষতার বলয় বা আল্লাহুস সামাদ। আমরা আল্লাহ্‌কে বিশ্বাসি প্রতিটি মানুষ তাঁর অনুসন্ধান করি বা তাঁকে ডেকে লাভ করবার জন্য প্রচেষ্টায় রয়েছি। আমার ডাকটা যত দূর পর্যন্ত পৌঁছাবে তত টুকু পরিমাণ আমাকে ফল দেওয়া হবে। কালামপাকে বিভিন্ন আয়াতে এভাবে অনুধাবন করা রয়েছে।

আমাদের পরকালীন যে জিন্দিগি রয়েছে অর্থাৎ আমরা সবাই যে মৃত্যু বরণ করব। জন্ম যেহেতু নিয়েছি মৃত্যুর স্বাদ অবশ্যই গ্রহন করতে হবে। মৃত্যু পরবর্তী ব্যবস্থাকে পরকাল বলা হয়। তাহলে পরকালীন জিন্দিগিতে আল্লাহ্‌ এক জার্‌রা পরিমাণ ইনজাসট্রিস করবে না। অর্থাৎ পারসিয়ালটি করবেন না বা কারো পক্ষপাতিত্ব অবল্বন করবেন না। সুস্পষ্ট ভাবে এটা বলে দেওয়া রয়েছে। যদি পক্ষপাতিত্ব অবলম্বন না করে তাহলে কর্ম গুনে যে বিচার ব্যবস্থা রয়েছে, আমি আপনি যে কর্ম করব তার ফল আমাকে আর আপনাকেই বহন করতে হবে। কেউ কারো টা নিবে না। তাই মহা নিরপেক্ষতার দৃষ্টান্ত এই আয়াতে কারিমায় এটা উল্লেখ করা হয়েছে যে:- আল্লাহুস সামাদ অর্থ তিঁনি মহা নিরপেক্ষ। অর্থাৎ নিরপেক্ষতার চাইতেও যদি বেশি কোন ব্যবস্থা থাকে সেই ব্যবস্থাকে বলা হয় মহা নিরপেক্ষ। অর্থাৎ তিঁনি কারো পক্ষ নেন না। যে যেভাবে তাঁকে তালাশ করে, যে যেভাবে তাঁকে ডাকে, যার ডাক তাঁর পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তাঁর ডাকে অবশ্যই তিঁনি সাড়া দেন। আমি আপনি হয়ত ডাকটা ঐ ভাবে দিতে পারিনি। তাঁর কর্ণ গোচর পর্যন্ত হয় না, যার জন্য আমার আপনার ডাক শুনে না। আর শুনবেই বা কিভাবে ? এর মূল কারণ হলো যে সংবিধান বা যে নিয়ম নীতির উপর আমাদেরকে থাকতে বলা হয়েছে সেই সংবিধান বা নীতিতে আমরা নেই, বা সেই সংবিধানে আমরা ধাবিত হই না। যার জন্য উঁনি ডাকের জবাব দেন না।

সেই সত্ত্বা – ৩৯

সুরা মুমিনের ৬০ নাম্বার আয়াতে প্রথম অংশেই উঁনি বলেছেন:- ওয়াকলা রাব্বিকুম, উদুনি আস্তা জেবলাকুম। অর্থ:- তুমি একা ডাক, ডাকের সঙ্গে সঙ্গে জবাব পাবে। তাহলে জবাব যদি পেতে হয় তাহলে একা একা ডাকার নির্দেশ দিয়েছেন। এই একা ডাকার যে ব্যবস্থা, সেই ব্যবস্থার মূল ধারা হলো এই একা হয়ে মহা নিরপেক্ষতার উদ্ভাসন করতে হবে।

ব্যক্তি কেন্দ্রিক যে ব্যবস্থায়ন সেই ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে যারা পীর বা মোর্শেদ প্রদত্ত যে ব্যবস্থায় মোরাকাবা মোশাহেদায় লীন বা ধাবিত হয়েছেন, সেই মোরাকাবা মোশাহেদার কার্য্যের মাধ্যম দিয়ে মহা নিরপেক্ষতার অবয়বকে জারী করতে হবে বা তুলে ধরতে হবে। যদি তা পরিষ্ফুটন হয় বা কার্যকারিতা পায়, তবেই সেই কার্য সফল হবে এবং তাঁর উদ্ভাসন প্রক্রিয়া হবে।

এটা যদিও আধ্যাত্মিক। জাগতিক ভাবেও আমরা এই বিশ্বাস বা আকিদার উপর প্রতিষ্ঠিত যে, উঁনি একজন মহা নিরপেক্ষ। কারো প্রতি তিঁনি ইনজাট্রিস বা পারসিয়ালটি করবেন না। তাহলে সেই মহা নিরপেক্ষতার বলয়কে আঁকড়ে ধরে ফলপ্রসু করতে হবে। এটাই এই আয়াতে কারিমায় উঁনি সুস্পষ্টভাবে সকল কথার জঞ্জালকে অপসারণ করে বা জলাঞ্জলি দিয়ে এক কথায় সমর্পণ করেছেন। গোটা জাহানের মানব মন্ডলীর জন্য এই আয়াত দ্বারা সমাধান করে দিলেন যে, তিঁনি মহা নিরপেক্ষ। তাই তিঁনি কারো পক্ষপাতিত্ব করবেন না। তৃতীয় আয়াতে বলা হলো:- লাম ইয়ালিদ, ওয়ালাম ইউলাদ। অর্থ:- তাঁকে কেউ জন্ম দেয় নি, তিঁনিও কারো কাছ থেকে জন্ম নেন নি। তাহলে জন্ম কে দেয় ? জাগতিক ভাবে এটা আমরা সবাই বুঝি যে, তাঁকে কেউ জন্ম দেয় নি, তিঁনিও কারো কাছ থেকে জন্ম নেন নি।

তিঁনি যদি জন্ম না দেন তাহলে আল্লাহ্পাক সবকিছু করেন এই কথার ভিত্তিটা কোথায় ? অবশ্য কোরানুল মাজিদের সুরা আল-ইমারানের অপর আয়াতে বলা রয়েছে যে:- তাঁর নির্দেশ ব্যতিত কারো-ই জন্ম হয় না। এ কথাটাও বলা রয়েছে। তাহলে এখানে তিঁনি বললেন:- তাঁকে কেউ জন্ম দেয় নি, তিঁনিও কারো কাছ থেকে জন্ম নেন নি। এটা হলো তার ব্যক্তি কেন্দ্রিক ব্যবস্থা মানে একক সত্ত্বাকে পরিষ্ফুটন করে মেলে ধরবার জন্যই এই আয়াতে কারিমা।

সেই সত্ত্বা – ৪০

তাই আল্লাহ্পাক সুস্পষ্ট বলে দিলেন যে, তাঁকে কেউ জন্ম দেয় নি, তিঁনিও কারো কাছ থেকে জন্ম নেন নি। তাহলে জন্মটা কোথা থেকে হলো ? আমি আপনি আল্লাহ্র সৃষ্টি। তাহলে এটা একটি রহস্যময় ব্যবস্থা। তিঁনি তো মহা বিশ্বের মহান স্রষ্টা। তাহলে তাসাউফধারী বা সুফিজম কী বলে ? জন্মই যদি না দেন তাহলে তিঁনি কোথা থেকে আসলো ? সুফির আসনে যেটা ভাবতত্ত্ব ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল বা এটা নিয়ে তাদের গবেষণা কালচার কার্যকারিতায় দাঁড়াতে তারা ওয়াকিবহাল থাকে। সেই আলোচনাগুলো মানুষের দোরগোঁড়ায় তুলে ধরার প্রচেস্টা করা হয়।

আয়াতে কারিমায় বলা হলো:- তাঁকে কেউ জন্ম দেয় নি, তিঁনিও কারো কাছ থেকে জন্ম নেন নি। কিছু বলা বিষয় বলা যায় না কিন্তু আসলে ধারণাটুকু আমরা আপেক্ষিক ভাবে এদিক ওদিক করে বুঝানোর জন্য চেস্টা করি। কারণ স্রষ্টার সান্নিধ্যের মূল ধারার কথা গুলো যদি প্রকাশিত হয়ে যায়, তাহলে জগতে সে বিতাড়িত হয়ে যাবে। অর্থাৎ আল্লাহ্র সে সৌন্দর্য্যময় ব্যবস্থাটুকু আর থাকবেনা। এজন্য গুপ্ত ব্যবস্থা যখন প্রকাশিত হয়ে যায় তখন ফাসেকী রুপ হয়ে যায়। এজন্য অনেকেই হয়ত তার বুদ্ধি বা বিদ্যার জ্ঞান দ্বারা এটাকে আগলে জানবার বা বোঝার চেষ্টা করেন। কিন্তু এটা তা নয়। এই আটকানো ব্যবস্থাকে আরও দৃঢ়করণ করতে হবে। তাহলে তিঁনি কেমন সত্ত্বা যে:- তাঁকে কেউ জন্ম দেয় নি, তিঁনিও কারো কাছ থেকে জন্ম নেন নি। আহাদ সত্ত্বা যখন সামাদ সত্ত্বাতে রুপান্তর হতে হতে সমাসীন হয়ে যায়। তখনই তিঁনি জন্ম মৃত্যুর উর্ধ্বে বিচরণ করে। অর্থাৎ পূর্ণতার একটি অবয়ব একক রুপে পরিগণিত হয়। এই পরিগণিত অবয়ব বা অখন্ড, অদ্বিতীয়, স্বয়ংভূ সত্ত্বা যখন কোন মানবের মধ্যে জাগ্রত হয় তখনই তিঁনি জন্ম মৃত্যুর উর্ধ্বে অবস্থান করেন।

তাহলে উৎপত্তিটা কোথা থেকে আসলো ? এটা হলো সৃষ্টির চরম রাজ্যে। এই গবেষণায় যেতে শরিয়তে নিষেধ করা রয়েছে। কারণ আপনি যদি এই গবেষণাতে যান তাহলে আপনার ব্রেনের কন্ট্রোলে না থাকলে আপনি মেন্টাল ডিজিজ হয়ে যেতে পারেন। আপনি আর এটা সহ্য করতে পারবেন না। আর এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার জন্য ওলিদের স্বরণাপন্ন হবার জন্য বা উছিলা অন্বেষণ করবার জন্য বিভিন্ন ভাবে আল্লাহ্ নির্দেষ করেছেন।

তাহলে এর মূল উত্তরটা কি ? আসলে এর মূল উত্তরটা হলো তিঁনিই সব। তিঁনিই প্রকাশিত, তিঁনিই বাতেনি। তাঁর দ্বারাই সৃষ্টি, তাঁর দ্বারাই স্রষ্টা। অর্থাৎ সকল কিছুতেই একাকার। এক ভিন্ন দুই নাই। এজন্য একত্ত্ববাদে সব লীন রয়েছে। দুইটি সত্ত্বাকে উঁনি এই সীমিত স্বাধীন সত্ত্বা দান করবার কারণে দুনিয়ায় এই বিষয়গুলো কালচার এবং আলোচনা হয়।

যদি আমরা সকল মানুষকে নিয়ে বিচার করি বা সকল সৃষ্টিকে নিয়ে যদি বিচারিক জ্ঞান দ্বারা এই আয়াতে কারিমা মেলানোর চেষ্টা করি, তাহলে কিছুটা হিমশিম খেতে হয় অর্থাৎ একটু ভিন্নতার মত এসে যেতে পারে। কিন্তু এখানে কোন ভিন্নতা নেই। কেন ? কারণ আল্লাহ্পাক এই সুরা ইখলাসের প্রথম আয়াতেই বলছেন যে:-আল্লাহু আহাদ। অর্থ আল্লাহ্ একক। যে একক সত্ত্বাটা প্রতিটি মানুষের মধ্যে বিরাজিত। আর এই একক সত্ত্বায় লীন হবার জন্য আমাদের তাগিদ করা রয়েছে। যদি সেই তাগিদে কেউ উপন্নিত হয়, তাহলে তিনি আল্লাহ্র এই চূড়ান্ত রুপের অবয়বে বা জাগরিত হবার চূড়ান্ত প্রক্রিয়াতে সফল হলে তিঁনি কাউকে জন্ম দেন না। এটা কালামপাক সাক্ষ্য দিচ্ছে। যেহেতু আমরা এই ধর্মের অনুসারী। আমাদের সংবিধান যা বলে সেই বিধান অনুযায়ী (মহা পুরুষদের পথে) পরিচালিত হতে হবে।

আপনারা সবাই জেনে থাকবেন যে, আঠার হাজার মাখলুকাত সৃষ্টি রয়েছে। তার মধ্যে সতের হাজার নয়শত আটানব্বই মাখলুক হলো আল্লাহ্র তাবেঈ অর্থাৎ তারা তৌহিদ রাজ্যে বসবাস করে। মানুষ আর জ্বীন এই দুইটি মাখলুককে আল্লাহ্ স্বাধীন সত্ত্বা দিয়ে দুনিয়াতে বা সৃষ্টি রাজ্যে প্রেরণ করেছেন। এই সৃষ্টিরাজ্যে এই দুইটি সত্ত্বা প্রেরিত হবার কারণে এই সকল বিষয় গুলো কালচার হয়। আর অন্যান্য সকল সৃষ্টি তৌহিদ রাজ্যে অর্থাৎ একত্ত্ববাদ সুরা ইখলাসের আকিদাতেই তারা প্রতিষ্ঠিত।

উদাহরণ:- যেমন এই সৃষ্টিরাজ্যে বৃক্ষ, তরুলতা, জীবজন্তু সকল কিছু আল্লাহ্র সেজদ্ায় রত। তাহলে একটি বৃক্ষ বা গাছ কিভাবে সেজদ্া দেয় এটা আমরা কখনও কি চোখে দেখি ? কিন্তু কোরান এ কথা বলছে। তাহলে এর সত্যটা কি ? কোরানকে আমরা বিশ্বাস করি, তাহলে গাছ সেজদ্া দেয়। অপর আয়াতে আল্লাহ্পাক বলেছেন:- গাছ বা যা কিছু তৌহিদ রাজ্যে আছে, তারা সবাই আল্লাহ্ জিকিরে রত। তাহলে গাছ কিভাবে জিকির করে ?

তাহলে এটা আমরা শুনিনা, তাহলে কিভাবে শুনতে পাবো ? সকল কিছু যে আল্লাহ্‌র তৌহিদ রাজ্যে বাস করে এটা বুঝতে হলে নিজেকে এই ইখলাস বা একত্ত্ববাদে সমাসীন করতে হবে। যে ব্যক্তি এই সত্ত্বায় সমাসীন হয়েছে তিঁনি এই স্রষ্টার যত সৃষ্টি রয়েছে তাদের আকিদা বা তাদের কথা বার্তা সম্পর্কে পরিজ্ঞাত হয়।

এজন্য আল্লাহ্‌র হাবিব উটের সঙ্গে কথোপকথন হয়েছে এ হাদিস সম্পর্কে আমরা জেনেছি। তাহলে উঁনি এই সৃষ্টিরাজ্যে এই ইখলাসকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। এজন্যই উঁনি সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ। উঁনার নবুয়্যত সর্বশ্রেষ্ঠ বলে আল্লাহ্‌ খ্যাঁতি করেছেন। যদিও অপর আয়াতে আল্লাহ্‌ বলছেন যে:- আমার নবীগণের মধ্যে তোমরা ছোট/বড় পৃথক করিও না। কারণ সমসাময়িক যুগ হিসাবে আমিই (আল্লাহ্‌) তো প্রতিনিধিগণ প্রেরণ করেছি।

সকল সৃষ্টির মূল আঁধার তিঁনিই। তাহলে এই মূলকে বা মূলের ধারাতে যদি আমরা পৌঁছাইতে চাই, তাহলে এই ইখলাসকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। প্রতিষ্ঠিত করলে কি হবে ? আইনুল একিনের ফোকাস আসবে অর্থাৎ সে দৃশ্যায়ন হবে, সকল কিছু সে দেখবে।

এটাকেই আমরা আমাদের সুফিমতের ধারায় আত্মার মুক্তির স্তর বলে থাকি। অর্থাৎ প্রতিটি মানুষ যাকে আমরা আত্মা বলে থাকি। অবশ্য আত্মার দুটি বিভাজন জাগতিক ভাবে বা অনেক কিতাবে এটা সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে। একটা হলো জীবাত্মা যাকে আমরা নফ্‌স বা দেহধারী মানুষের অবয়ব বলে থাকি, আরেকটির নাম হলো পরমাত্মা যাকে রুহ বলে থাকি। এই পরম আত্মাই হলো আল্লাহ্‌ সত্ত্বা। যাকে কালামপাকের ভাষাতে রুহ বলে সম্মোধন করা হয়েছে।

তাই এই পরমকে লাভ করাই হলো ধর্মের মূল নিশানা বা মূল চালিকা শক্তির একটি অবয়ব। এজন্য সেই মূল চালিকা শক্তি হলো আল্লাহ্‌। আমরা অনেকেই হয়ত উপরের দিকে তাকিয়ে বলি উপরে একজন আছে কিন্তু এটা বদ্ধমূল ধারণা। সুফিদের আকিদা বা কথা হলো প্রতিটি মানুষের মধ্যে আল্লাহ্‌ বিরাজিত।

তাহলে আমার আল্লাহ্ আমার ভিতর থেকেই সবকিছু জানেন, দেখেন, শোনেন। যার জন্য কোন অবয়ব লাগে না, কোন মাধ্যম লাগে না কোন ব্যবস্থা লাগে না। কারণ প্রতিটি মানুষের মধ্যেই আল্লাহ্ সত্ত্বা বিরাজিত। আমরা যে দুঃখ-কষ্ট, ক্লেশ, যন্ত্রণা এগুলো ভোগ করি কেন ? কারণ আল্লাহ্ আমাকে ঠিকিই দেখেন কিন্তু আমি তাঁকে দেখিনা। আমাদের এই সমস্ত দুঃখ যন্ত্রণা বা যত রকমের অশান্তির মূল কারণ রয়েছে, আল্লাহ্কে না দেখাটাই হলো এসব কিছুর মূল কারণ।

যিনি দর্শনে এসে গেছেন তাঁর আর এগুলো থাকে না। তার আর কোন বিড়ম্বনা নেই। তাই এ কারণে বলা রয়েছে যে মূল ধারাকে যদি কেউ লাভ করতে চায় তাহলে এই পীরের আশ্রিত ব্যবস্থার মাধ্যম দিয়ে, মোরাকাবা মোশাহেদার মাধ্যমে যে আত্মার জাগরণ হয়, সেই জাগরণকৃত ব্যবস্থা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছানোটাই হলো এই আত্মার মুক্তি।

এজন্য প্রতিটি মানুষেকে আত্মার মুক্ততা করার জন্যই এই ধর্ম এসেছে। এটাই হলো সংবিধান। তাই এই ধর্মের খুঁটিনাটি যত বিষয়াবলী আছে সবকিছু সংবিধান সাহায্যকারী হিসাবে কার্যকারিতা করবে আর সেই সংবিধান হলো এই আল-কোরান। তাহলে এই আল-কোরানকে আমরা যে আমাদের সীমিত জ্ঞান গরিমা দ্বারা যদি বুঝতে না পারি, তাহলে এটা বুঝবার জন্য হাদিসের আশ্রয় নিতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ তাঁর হাবিবের অনুসরণ করবার কথা বলা হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যম দিয়ে পরিপূর্ণতাকে লাভ করা।

ধর্মের মূল নিশানাটাই হলো এই আত্মার মুক্তির উদ্দেশ্য। এটা যত দ্রুত করা সম্ভব, ততই এটা ফলপ্রসু বা কার্যকর হবে। এই কার্যকারিতার দিকে আমরা যদি ধাবিত না হই এর প্রয়োগ পদ্ধতিতে অনুশীলনগামী ব্যবস্থার দিকে যদি না হাঁটি তাহলে আমাদের পথচলাটা বৃথা হয়ে যায়। এই কথার কোন কার্যকারিতা হলো না। শুধু আলোচনায় থেকে গেল। এখন কিতাব কোরান বলে যা জানি তা প্রত্যেকটি মানুষের ঘরে ঘরে এক খানা করে সংরক্ষণ করে রাখা হয় তাহলে তো কোন কার্যকারিতা হলো না।

এই কালামপাকের একটি আয়াতও যদি কারো দেহ রাজ্যে প্রতিফলন বা বাস্তবায়ন ঘটায় তাহলেই এটার কার্যকারিতা হলো, এই সংবিধানের স্বার্থকতা

রইল। অনুশীলনগামী ব্যবস্থার মাধ্যম দিয়ে এই আয়াতে কারিমাগুলো দেহ রাজ্যে কার্যকারিতা লাভ করে। তো এজন্য এই কার্যকারিতার চূড়ান্ত রুপ, আল্লাহ্‌র তিনটি রুপকে এই সুফিতত্ত্বে বিভাজন করে বলা হয়। এই তিনটি রুপের মধ্যে সবচেয়ে চূড়ান্ত রুপ হলো এই লা।

মানে লা সত্ত্বায় আল্লাহ্‌পাক প্রথমে কালামপাকে বলেছেনঃ- কূলহু আল্লাহু আহাদ। অর্থঃ- বলো আল্লাহ্‌ একক। দ্বিতীয় হলো আল্লাহুস সামাদ। অর্থঃ- তিঁনি মহা নিরপেক্ষ। তৃতীয় হলোঃ- লাম ইয়ালিদ, ওয়ালাম ইউলাদ। অর্থঃ- তাঁকে কেউ জন্ম দেয় নি, তিঁনিও কারো কাছ থেকে জন্ম নেন নি। অর্থাৎ লা শরীক বলতে তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁর কোন বিভাজন নেই। তাই লা শরীকের দলিল আয়াতে কারিমাগুলো এভাবে রয়েছে।

এই লা শরীক বলতে আসলে এটা জাগতিক ভাবে বা রুপক অবস্থায় বলা হয়ে থাকে। কিন্তু লা শরীক হলো চূড়ান্ত অবয়বে আল্লাহ্‌র মূল ধারা। অর্থাৎ আমি আপনি আল্লাহ্‌র যত সৃষ্টি রয়েছে সকল সৃষ্টি তো তাঁর থেকেই সূচনা হয়েছিল। এ বিষয়ে ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) আল্লাহ্‌র বর্ণনায় বলেছেন যে, আমি ঐ নূর যা লা মাকামে বিদ্যমান ছিলাম।

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র প্রথম অবয়ব তিঁনি যে সৃষ্টি করেছেন, প্রথম সৃষ্টি হলো নূরে মোহাম্মদ। তাহলে নূরে মোহাম্মদ হলো দ্বৈত সৃষ্টি অর্থাৎ বিকাশিত একটি রুপ, আল্লাহ্‌ থেকে দ্বিতীয় অবয়বের সৃজন হলো। এই নূরে মোহাম্মদ হতে গোটা সৃষ্টি রাজ্যে যত মাখলুক রয়েছে এই মাখলুকগণ সকল সৃষ্টি এভাবে হয়েছে। এটা হলো বিকশিত ধারা হতে আবার বিকশিত। এটাকে বলা হয় সৃষ্টি সেফাতি গুণ সত্ত্বার ধারাবাহিকতা। যেমনঃ- তুলা থেকে সুঁতা হয় এবং এই সুঁতা থেকে কাপড় হয় আর সুঁতা রঙ্গিন হয় বিভিন্ন রঙের যে উপকরণ মেশানো হয় সেই উপকরণের সমৃদ্ধায়ন হলে এটার আরেকটি অবয়ব জারী হয়। তাহলে তুলা হলো মূল আর সুঁতা হলো সেটার গুণ। অর্থাৎ তুলা হলো জাত আর সুঁতা হলো সেফাত এবং কাপড় হলো সেফাতের সেফাত। কাপড়কে নিয়ে নিজের পরিধেয় বস্ত্র বা অন্য সামগ্রী তৈরী করলে সেটা হলো আরেকটি সেফাত।

ভাবে সৃষ্টির ক্রমবিকাশময় ধারাবাহিকতা গুলো এই সৃষ্টির মূল ধারা থেকে এসেছে। কিন্তু মূলে যিনি পদার্পন করতে পারে বা মূল ধারার পূর্ণতার অবয়ব হয় তিঁনি এই বর্ণনা করেছেন যে:- তাঁকে কেউ জন্ম দেয় নি, তিঁনিও কারো কাছ থেকে জন্ম নেন নি।

বিজ্ঞানী ডারউইন মতবাদে বর্ণনা করেছেন যে, এই মানুষের সৃজন বা অস্তিত্ব হলো শৈবাল বা সাগরের এক ধরনের শেওলা থেকে। তাদের মতে পানিতে সূর্যের কিরণ পরে। সূর্যের কিরণ পরলে সেখান থেকে শেওলার সৃষ্টি হয় এবং শেওলাটা ধীরে ধীরে প্রবৃদ্ধি হয়। প্রবৃদ্ধি হলে মোটাতাজা হয়ে গাছের মত হয়। এই শেওলা থেকে রুপান্তর হতে হতে এই মানুষের সৃষ্টি হয়েছে। সৃষ্টির বিবর্তনের ধারা অনুযায়ী এটা পরিবর্তিত হতে হতে এভাবে হয়েছে। অর্থাৎ বিজ্ঞানী ডারউইন কিন্তু আল্লাহ্‌কে মানে না। এটা বললাম বিজ্ঞানী ডারউইনের মতবাদের কথা। তারা এভাবে বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ্‌র এই অবিভাজনকৃত ব্যবস্থা সম্পর্কে ইমাম গাজ্জালী এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, আমি ঐ নূর যা লা মাকামে বিদ্যমান ছিলাম। আমি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য নিজেই নিজের রুপে বিভোর হলাম। আমি কখনও ঈসা, কখনও মুসা, কখনও জাকারিয়া সর্বশেষ মোহাম্মদ রুপে অবতার হয়ে ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করবার নিমিত্তে দুনিয়াতে সমাসীন হয়েছি। কত মৃত্যুর যন্ত্রণা আমি বহন করে চলেছি।

এই বিভাজন বা ট্রান্সফার বা স্থানান্তরিত ব্যবস্থা অর্থাৎ এটাকে যদি দ্বৈত নীতিতে কল্পনা করি তাহলে আমাদের পাপ হবে, আপনাদের বুঝবার জন্য বলা হচ্ছে। তাহলে উঁনি নিজেই নিজের রুপে বিভোর হলেন। এই যে রুপের দর্শন সেই দর্শন থেকে বিভাজনকৃত ব্যবস্থায় আজকে পৃথিবীর বুকে ৭৫০ কোটিরও অধিক মানুষ এসেছি এবং মানুষের একেক জনের একেক রুপ। কোন রুপের সঙ্গে অন্য কোন রুপের সংমিশ্রন বা মিল নেই। হয়ত কাছাকাছি হতে পারে কিন্তু কোথাও না কোথাও ভিন্নতা বা পার্থক্য রয়েছে। অর্থাৎ এখানে ইমাম গাজ্জালী যখন স্রষ্টার সান্নিধ্যের মূল ধারাতে পৌঁছায়, তখনই কিন্তু তিনি এই ঘোষণাটুকু দিতে পারেন। যে আমি ঐ নূর যা লা মাকামে বিদ্যমান ছিলাম। এটা হলো আল্লাহ্‌র চূড়ান্ত একটা স্টেজ বা অবস্থান সম্পর্কে ইমাম গাজ্জালী তুলে ধরেছেন তাঁর কিতাবের মধ্যে।

তাই তাঁর নিজের রুপের বিভোরকৃত যে অবস্থা, সেই বিভোরকৃত অবস্থাটাই হলো:- তাঁকে কেউ জন্ম দেয় নি, তিঁনিও কারো কাছ থেকে জন্ম নেন নি। এই বিষয়ে পরিপূর্ণতার অবগাহন হলে তিঁনি নিজেই নিজের মত করে বিভাজন হয়েছেন। সেই বিভাজনকৃত ব্যবস্থাটাই হলো মানবাত্মার মধ্যে যে রুহ রুপে আল্লাহ্ বিরাজিত আছেন এটাই হলো সেটা।

আপনারা জাগতিক বা শরিয়তি আলেম সমাজের মুখে শুনে থাকবেন যে, সকল রুহের সৃজনকৃত ব্যবস্থা একই দিনে একই সময়ে। তাহলে সকল রুহের যে সৃষ্টি এটাই হলো স্রষ্টার একটি বিভাজনকৃত ব্যবস্থা। সেই বিভাজনকৃত ব্যবস্থাটি প্রতিটি মানুষের মধ্যে একক সত্ত্বার রুপে বিকশিত হয়ে জারী হয়। সেটাই হলো এই:- লাম ইয়ালিদ, ওয়ালাম ইউলাদ বা তাঁকে কেউ জন্ম দেয় নি, তিঁনিও কারো কাছ থেকে জন্ম নেন নি, এটাই এই আয়াতের কারিকুলাম বা কার্যকারিতা।

যিনি আল্লাহ্র নবী হন, তিঁনি আল্লাহ্র প্রতিনিধি। এইটা কলেমার সঙ্গে সংযোজিত করে দেওয়া রয়েছে। এর অর্থ যিনি নবুয়তের সনদ হন, তিঁনি হলো স্রষ্টা। তাঁর আর আল্লাহ্র মধ্যে কোন বিভাজনকৃত ব্যবস্থা থাকে না। কলেমার তাফসিরে বা আলোকপাতে এটা সুবিস্তৃত ভাব ধারায় বর্ণনা করা হয়েছে। সেই প্রক্রিয়ার তরান্বিত যে ভাব ধারা, সেটাই হলো এই লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ এর কারিকুলাম। তাহলে সকল কারিকুলামই তো তাঁর। তাই ইমাম গাজ্জালী সুফিমতাদর্শের আলোচনায় বলেছেন যে, আমি ঐ নূর যা লা মাকামে বিদ্যমান ছিলাম। এটা কী আসলে ইমাম গাজ্জালী বলেছেন ? আল্লাহ্র কথাটাই ইমাম গাজ্জালীর মুখ নিঃসৃত বাণীতে প্রকাশ হয়েছে।

তাহলে উঁনি নিজেই নিজের রুপে বিভোর হলেন। তিঁনি কখনও ঈসা, কখনও মুসা, কখনও জাকারিয়া সর্বশেষ মোহাম্মদ রুপে অবতার হয়ে দুনিয়াতে সমাসীন হয়েছেন। এ কথা বললে যাদের আল্লাহ্র উপরই বিশ্বাস নেই তাদের মনে দাগ লেগে যাবে। এজন্য সুফির মূল ধারার কথা গুলো বাস্তবতায় এভাবে পুস্তকে উপস্থাপন করাটাও একটি সমস্যা গ্রস্থ বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। মূল ধারার কথা এসে গেলে জাগতিক বন্ধন পরে যায়। কেন তুমি কি বলছো ? এই আপনাকে গলা টিপে ধরা হতে পারে। কারণ এই আধ্যাত্ববাদের কোন দলিল থাকে না এটা দর্শনবাদের ভিত্তিতে যার যার দর্শনের উপলব্ধি যেমন হবে, তার

বলার বয়ানকৃত ব্যবস্থাও সে রকম হয়ে যায়। এই হলো মূল ধারা। এজন্য এই লা শরীক হলো চূড়ান্ত আল্লাহ্। অর্থাৎ লা শরীক স্তরে যদি কোন মানুষ জাগরিত হয় তাহলে তার নির্দেশ আল্লাহ্র নির্দেশের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। সেটা হলো এমন যে, তিঁনি যদি বলেন:- আমরা যারা পাবনা বসবাস করছি তাদের সবাইকে ফ্রান্সের একটি জঙ্গলে ফেলে দাও। তাহলে সঙ্গে সঙ্গে সেটা কার্যকারি হয়ে যাবে। এটা হলো এই লা শরীক আল্লাহ্র অবয়ব। অর্থাৎ এখানে বিভাজনকৃত ব্যবস্থা থাকে না। অর্থাৎ উঁনি যে সকল কিছুর মালিক এই প্রক্রিয়াটাই প্রমাণ করেছেন।

তাহলে আল্লাহ্র প্রতিটি নামের এক একটি কার্যকরি ক্রিয়াশীল গুণ ক্ষমতা রয়েছে। এগুলো না বুঝলে এই ধর্মের তালগোল পেকে যাবে। তাহলে এই সুফিমতের ভাবধারার বয়ান আর থাকবে না। তাহলে সবই দন্ডনীয় হয়ে যাবে। এজন্য সেই লা শরীকআলাতেই এই স্তর রয়েছে । যেখানে কারো কাছ থেকে জন্ম নেওয়া নেই, যেখানে কাউকে জন্ম দেওয়াটাও নেই। অর্থাৎ তিঁনি জন্ম মৃত্যুর উর্ধ্বে অবস্থান করেন। তিঁনিই সেই মূল সত্ত্বা। সেই মূল পর্যন্ত পৌঁছালেই এই আয়াতে কারিমার তাৎপর্য্য কার্যকারিতা পায়।

তাহলে কোথায় সেই মূল সত্ত্বার অবয়ব। আর কোথায় এই বিভাজনকৃত রিপু তারিত ব্যবস্থার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে তাঁকে চিন্তার রাজ্যে নিদর্শন করে আমরা পরিমাপ করি বা ওজন করি। সেটা ভূল হবে। তাই তাঁর সেই অবয়বকে মানে প্রাপ্তির জন্য এই উছিলা রাখা রয়েছে। যদি উছিলা না থাকতো তবে সরাসরি সেই জালুয়াতে মানুষ আর তাঁকে কোন দিনই খুঁজে পেত না। অর্থাৎ তাঁর জালুয়াতে পুড়ে ভস্ম হয়ে যেত তাঁর অস্তিত্ব কোথাও আর খুঁজে পাওয়া যেত না।

তাহলে মানবিক গুলাবলির যে গুন, যে মূল ভাব ধারা শক্তি সেই শক্তি যদি কারো আকিদাতে সন্নিবেশিত হয়, স্থানান্তরিত হয় বা কার্যকারিতা পায়। তাহলে ধীরে ধীরে তিনি ঐ শক্তিতে উপন্নিত হলে তবেই তাঁকে দেখা যাবে। হুট করে আমি দেখব তা দেখা যাবে না। এটার প্রমাণ মুসা কালিমুল্লাহকে নিদর্শন স্বরূপ আমাদের দিয়ে রেখেছেন। তিনি আল্লাহ্কে দেখতে চাওয়ার পরেও তিনি দেখতে পারেন নি। কেন ? পর্বত পুড়ে সুরমা তে রুপান্তর হয়ে

গিয়েছিল। কারণ ঐ জালুয়ার ক্ষমতার ধারণকৃত ব্যবস্থার যে ক্ষমতায়ন সেইটা তিনি নবী হওয়ার পরেও তাঁর মধ্যে ছিল না। এটাই উসিলার প্রমাণ। তাহলে একটি মানুষকে এই গুণ ক্ষমতা বা ক্রিয়াশীল ব্যবস্থা কার্যকারী করবার জন্য আরেকটি মানুষকে অবলম্বন হিসাবে ধরতে হয়। এটাই উছিলা, এটাই মোর্শেদ বা পীরতন্ত্রের মূল ভাবধারা। আর এই আমল বা কার্যকারিতার মধ্য দিয়েই প্রতিটি মানুষের সঙ্গে যে শয়তানি সত্ত্বা বা মন্দ সত্ত্বা বিরাজিত। সেই ব্যবস্থাকে ডাইভার্ড করার কলা কৌশল রাখা রয়েছে। কারণ শয়তান কোন আমল নীতিতেই বন্ধন তৈরী করে না একমাত্র তাসাব্বুরে শায়েখ।

এই তাসাব্বুরে শায়েখটা কী ? এই তাসাব্বুরে শায়েখ হলো পীরের ধ্যান বা পীরে সঙ্গে একত্রিত ভাবে সমাসীন হবার যে প্রক্রিয়া সেটাকেই তাসাব্বুরে শায়েখ বলা হয়। তাহলে এই প্রক্রিয়ায় যে ব্যক্তি পীর বা মোর্শেদের রুপকে ধারণ করে, সেই রুপে সন্নিবেশিত কার্যকে ফলপ্রসু করবার প্রচেষ্টা। তাহলে এই পীর থেকে রুপান্তরবাদ ব্যবস্থাটা জারিয়া হয়ে যায়। এটা হলো এই রুপান্তরবাদ ব্যবস্থাকে ধীরে ধীরে ফলপ্রসু করবার কৌশল। সেই কৌশল হলো এই গুরুবাদ ব্যবস্থা। এজন্য গুরুবাদ ব্যবস্থার সূচনায় স্তর মাফিক যখন চূড়ান্ত অবয়বে সেই মহান সত্ত্বার গুণ ক্ষমতা একটি মানবের মধ্যে বিকশিত হবে তখনই তিনি এই আয়াতে কারিমার তারতম্য এবং স্বার্থকতা বুঝতে পারবেন যে, তাঁকে কেউ জন্ম দেয় নি, তিঁনিও কারো কাছ থেকে জন্ম নেন নি।

তাঁর এই অবস্থিত রুপকে জারী করলে সাধক তখন বুঝতে পারেন যে, তিঁনি জন্ম মৃত্যুর উর্ধ্বে অবস্থান করছেন। পূর্ণতার অবয়ব তার মধ্যে আল্লাহ্ সত্ত্বা জারিয়া হয়ে গেছে। তখনই সে বলতে পারেন যে, এটা আল্লাহ্র একত্ত্ববাদের পূর্ণতার বিকাশ। এখানে মানুষের সম্পৃক্তায়ন যদিও রাখা হয় নি, আধ্যাত্মিকতার বা গোপনীয়তার যে অবয়ব। এটা হলো আল্লাহ্র সঙ্গে বান্দার সম্পৃক্তায়নের মিলনকে পূর্ণ মারেফত বলা হয়।

তাই এটা সম্পৃক্তায়ণ করতেই এই আয়াতে কালাম জারী করেছেন যে:- লাম ইয়ালিদ, ওয়ালাম ইউলাদ। অর্থ:- তাঁকে কেউ জন্ম দেয় নি, তিঁনিও কারো কাছ থেকে জন্ম নেন নি। তিঁনি হলো সৃষ্টির আদিতে পূর্ণতার যে অবয়ব, যে বিকশিত ভাব ধারায় জাগরণ ছিল বা যেখান থেকে সৃষ্টির ক্রমবিকাশময় ধারাতে সৃষ্টি হয়েছে। সেই সৃষ্টির মূল ধারাকে এভাবে বর্ণনা করেছেন।

সর্বশেষ আয়াতে বলা হলো:- ওয়া লাম ইয়া কুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ। অর্থ:- তাঁর (আহাদের) সমতুল্য কেউ না। অর্থাৎ তিঁনি (আহাদ) কারো মুখাপেক্ষী না, তিঁনি অমুখাপেক্ষী।

এই সুরার প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে, কূলহু আল্লাহু আহাদ এবং শেষের আয়াতে বলা হলো:- ওয়া লাম ইয়া কুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ। তাহলে তিঁনি কে ? সেটা কোন সত্ত্বা ? যে মানব সত্ত্বাটা শয়তানি সত্ত্বাকে দুরিভূত করে পূর্ণতার অবয়বের জাগরণ ঘটিয়েছে সেই সত্ত্বাটা কারো সমতুল্য না, তাই কারো মুখাপেক্ষী হতে পারে না। অর্থাৎ তিঁনি কারো আশ্রয়, কারো দন্ড, কারো কথা, কারো অবতারণা, কারো সম্পৃক্তায়ন যত বিশেষণ আছে তিঁনি এসবকিছুর বাইরে অবস্থান করেন। তাই তিঁনি কারো মুখাপেক্ষী না।

এটাই হলো ধর্মের বা একত্ত্ববাদের মূল ধারা। এই একত্ত্ববাদে যিনি পূর্ণতায় ফলপ্রসূ করতে পেরেছেন, তিঁনিই কারো মুখাপেক্ষী না বা তাঁর সমতুল্য কেউ না। সেই সত্ত্বাটাই হলো আহাদ সত্ত্বা। এই আহাদ সত্ত্বা কারো মুখাপেক্ষী না বা তাঁর সমতুল্য কেহ না। অর্থাৎ তিঁনিই যে সর্বেসর্বা সেই প্রক্রিয়াটাই তিঁনি জানান দিলেন। তিঁনি সৃষ্টির পূর্ণ বিকাশ বা পূর্ণতার সেই সত্ত্বা। এটাই হলো সাধকের চূড়ান্ত অবয়ব। যেটা সুরা ইখলাসের শেষে এসে বর্ণনা করেছেন।

তাহলে এই একত্ত্ববাদের পূর্ণতাকে জারী করতে বলা হয়েছে। আল্লাহ্ এক, এই এক হলো স্বাভাবিক ভাবে। কারণ স্বাভাবিকতায় সকল মানুষের জ্ঞান গরিমা এক রকম থাকে না। জ্ঞানের তারতম্য অনুযায়ী মানুষের অবস্থান কমবেশি রয়েছে। যার জ্ঞান বেশি তার বুঝবার ক্ষমতা বেশি থাকে। কিন্তু যার জ্ঞান কম তার জন্যও তো ধর্মীয় বিধান থাকে। তাই আনুষ্ঠানিকতার যে সকল রেওয়াজ রয়েছে সেটা হলো স্বাভাবিক। আর এই আধ্যাত্মিকতার অবয়ব হলো অস্বাভাবিক।

এই স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিকের সমন্বয়ে থাকে হলো পূর্ণতা। এজন্য বলা রয়েছে এই জাহের এবং বাতেন এই দুইয়ের সমন্বয়ে ইসলাম। তাই ইসলামের মূল ধারা জানতে হলে আধ্যাত্মিকতা এবং জাগতিকের যে সকল বিধি বিধান রয়েছে উভয়ই জ্ঞাত হওয়াই ধর্মের মূল মন্ত্র বা ধর্মের মূল শিক্ষা। একমাত্র সত্যকে লাভ করলে সেখানে আর বিভাজন নেই। মুনসুর হাল্লাজ বলেছিলেন:- আনাল হক। অর্থ:- আমিই সত্য।

বাংলা ভাষায় এটাকে ভিন্নভাবে বলা হয় যে, আমিই আল্লাহ্। যদি তিঁনি আল্লাহ্ হয়ে যান তাঁর সমতুল্য যদি কেহ না হন বা তিঁনি যদি কারো মুখাপেক্ষী না হয়, তাহলে এখানে একটি পূর্ণতার সংকেত বা আভাস আমরা পেয়ে থাকি। আসলে মূল ধারাটা হলো:- একটি মানুষ তার কর্মযোগে সূচনালগ্ন থেকে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যখন পূর্ণতায় অধিষ্ঠিত হয়, তখন তাঁর আর আল্লাহ্র মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। তাই আল্লাহ্র কথাটা আমরা সাময়িক দৃষ্টিতে দেখতে পাই না বা শুনতে পাই না। যা প্রকাশিত হয় তা হলো তাঁর প্রতিনিধির মাধ্যম দিয়ে। তাকে সনদ করলে এই আল্লাহ্র কথাটা সেই বান্দার মাধ্যম দিয়ে প্রকাশিত হয়।

আমি সংক্ষিপ্ত আকারে আপনাদেরকে এই সুরার সর্বশেষ আয়াত সম্পর্কে একটু বোঝাতে চেষ্টা করি। সেটা হলো:- আপনারা জাগতিক ভাবে অনেক মাজ্জুব বা পাগল দেখে থাকবেন। তাঁদের দেখে থাকবেন যে, এদের ভোগ-বিলাস, শান-শওকত সবকিছু দিয়ে তাঁকে যদি পায়ে ধরেও নিয়ে আসেন, তারপরেও কিন্তু সে আপনার আশ্রিত ব্যবস্থার মধ্যে থাকবে না। কেন ? সে কারো মুখাপেক্ষী হতে চায় না, কারণ তার সমতুল্য বা সমকক্ষ কেউ না। সে রাস্তায় পড়ে থাকবে, সেখানেই তাঁর শান্তি, ওটাই তাঁর তৃপ্তি। কারণ তিঁনি কারো মুখাপেক্ষী না। মওলা তাঁকে যে গতিতে তরান্বিত করবে, সেই প্রক্রিয়াতেই তিঁনি থাকবেন।

তাই এই আহাদ সত্ত্বা অর্থাৎ একক, অখন্ড, অদ্বিতীয়, স্বয়ংভূ সত্ত্বার যে মূল ধারা, সেই ধারাতে বান্দা যখন অবলোকন করবে বা পরিপূর্ণতায় সে সিক্ত হবে, সেই সিক্ত হবার প্রক্রিয়া বা কারিকুলামই হলো:- তিঁনি কারো মুখাপেক্ষী না বা তাঁর সমতুল্য কেউ না। সেটা হলো এমন যে, যিনি মূল স্বত্ত্বা, যার শক্তিতে সকল কিছু সৃজিত হয়েছে, যিনি সকল কিছু পরিচালনা করেন। অন্নদাতা, রিযিকদাতা তিনি সকল কিছু শোনেন, সকল কিছু দেখেন, বোঝেন।

তাহলে তিঁনি বললেন যে:- তিঁনি কারো মুখাপেক্ষী বা তাঁর সমতুল্য কেউ না। তাহলে আমরা সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী। অর্থাৎ আমাদেরকে এই ইখলাস প্রতিষ্ঠিত করবার তাগিদ রয়েছে। এই ইখলাসকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে আমাদেরকে ইখলাসের আকিদার উপর সুবিন্যাস্ত ভাবধারায় প্রতিস্থাপন করতে

হবে। তাহলে আমরা অপরের উপর যে নির্ভরশীল, এই নির্ভরশীলতাকে ডাইভার্ড করতে হবে বা সরে আসতে হবে।

এই ডাইভার্ড বা সরে আসার যে মূল কেন্দ্র, সেই কেন্দ্রটাই রয়েছে হলো আপেক্ষিক। তাই শুরুটা আর হয় না। যে কারণে এদিকে মানুষ যেতে পারে না। এটা সম্পর্কে বুঝতে পারে না। যার জন্য বিভ্রান্তির শিঁকলে আবদ্ধ হয়ে যায়। যদিও এই প্রসঙ্গ গুলো একটু উচ্চ পর্যায়ের দর্শনের দিকে ধাবিত হয়, কারণ এই ইখলাস সাধারণ কোন বিষয় নয়।

এটা হলো আল্লাহ্‌র গুণ ক্ষমতাকে ধারণ করবার জন্য উপযুক্ততা তৈরী করবার প্রক্রিয়া। আমাদের যদি এই প্রক্রিয়াটা সুসম্পন্ন হয়, তাহলে এই সুরার আয়াতে কারিমায় যে ধারাবাহিক বর্ণনাগুলো তুলে ধরা হয়েছে সেইটা সেই মানবের মধ্যে বিকশিত বা প্রকাশ হবে। ঐ গুণগুলো সেই মানুষটার দ্বারা প্রকাশ হবে। তখন সৃষ্টিরাজ্যে যা কিছু তৌহিদে আছে তাঁর সঙ্গে মিশে আমি আপনি একাকার হয়ে যায়। তখনই মুনসুর হাল্লাজ বলেছেন:- আনাল হক। অর্থ:- আমিই সত্য বা আমিই আল্লাহ্‌। তাহলে কিভাবে বলেছেন ? এই প্রক্রিয়া যখন সুসম্পন্ন হয়েছে তখনই এই ঘোষণাটা দিয়েছেন। বাবা বায়েজিদ বোস্তামি বলেছিলেন:- লাই ছালাফি জুব্বাতি ছেওয়া আল্লাহ্‌তালা। অর্থ:- আমার এই জুব্বার মধ্যে আল্লাহ্‌ ব্যতিত আর কিছুই নেই। জমদগ্নি মুনি বলেছেন:- সোহ্‌হম সোহ্‌মি অর্থ:- তিঁনিই আমি, আমিই তিনি। শ্রী শ্রী চৈতন্যদেব বলেছেন:- তুঁই মুঁই, মুঁই তুঁই। বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন ওলিগন এভাবে বর্ণণা করেছেন। কিন্তু প্রকাশিত হয়েছে ঐ সমস্ত ওলিগণের মুখ নিঃসৃত অবয়বে। যার কারণে যখন এটা নিঃসৃত হয়েছে বা প্রকাশিত হয়েছে তখন তাঁরা সাধারণ মানুষের কাছে দন্ডায়মান হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে বিভিন্ন জ্ঞানীগণ যখন এটাকে নিয়ে থিসিস বা গবেষণা করেছেন তখন দেখা গেছে না আসলেই তাঁরা ঠিকই বলেছিলেন।

তাহলে এই দর্শনকৃত ব্যবস্থা বা এই ইখলাসকে যখন পরিপূর্ণ রূপে তিঁনি সমাসীন করতে পেরেছেন, তখন তাঁর আর কিছু নেই। অর্থাৎ সকল কিছুর কার্যকারিতা আল্লাহ্‌র দ্বারা সৃজিত হয়েছে বা কার্যকারিতা পেয়েছে। সেই প্রক্রিয়া গুলো তাঁর দ্বারা এক সময় বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল। এজন্য তিনি হয়ত এ কথা বলেছেন। কিন্তু আমরা বুঝতে না পেরে এটা জঞ্জাল বা বেদাত, কাফের, মূর্তাদ, এভাবে ফতুয়া দিয়ে তাঁকে ঝান্ডা দিয়ে আটকে ফেলি।

সেই সত্ত্বা – ৫২

মোর্শেদ কী ? মোর্শেদ হলো রাসুল (সঃ) দেখার আয়না আর রাসুল (সঃ) হলো আল্লাহ্ দেখার আয়না। তাহলে রুপান্তরবাদ হয়ে এসেছে। এই রুপান্তরবাদ কী ? আল্লাহ্র যত কথা সবকিছু আল্লাহ্ই মুখে বলেছে ? না এটার বর্হিপ্রকাশ ঘটেছে তাঁর হাবীব দ্বারা। অর্থাৎ মোহাম্মাদ (সঃ) উঁনার মুখ নিঃসৃত জবানীতে প্রকাশ হয়েছে। উঁনি বলছেন যে, এটা আল্লাহ্র কথা। এভাবে কোরান নাযিল বা লিপিবদ্ধ হয়েছে। না কী আল্লাহ্ অন্য কোন ভাবে এসে সরাসরি এটা বলছেন ?

তাহলে একটি মাধ্যম ব্যবস্থা রাসুলে পাক (সঃ) ব্যবহার করেছেন সেটা হলো জিবরাঈল আমিন নামক ফেরেশতার । জিবরাঈল আমিন আমাকে ওহী মারফত জানান দিয়েছেন তাই আমি আল্লাহ্র বাণী এভাবে প্রকাশ করলাম। এভাবেই তো আল্লাহ্র কালামগুলো এসেছে । তাহলে সরাসরি যদি না পাওয়া যায় তাহলে উঁনার সমতুল্য বা সমকক্ষ কেউ নেই। তিঁনি কারো মুখাপেক্ষী না। তাহলে আল্লাহ্ যে বিকশিত হয়, প্রকাশিত হয় এটা মানুষের মাধ্যম দিয়ে।

তাই এই মানব সুরতে বা অবয়বে আল্লাহ্র সকল প্রতিনিধি এসেছেন। অন্য কোন সুরতে বা অবয়বে আল্লাহ্র প্রতিনিধি আসেননি। আবার জ্বীন জাতির মধ্যেও আল্লাহ্র ওলি হয়, সেটা আমাদের আলোচ্য বিষয় না। তাহলে এই যে যুগে-যুগে, কালে-কালে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার মতান্তরে দুই লক্ষ ছত্রিশ হাজার নবী-রাসুল এসেছেন, তাঁরা সবাই এই মানুষ রুপে এসেছেন। এই মানুষের মাধ্যম দিয়েই আল্লাহ্র বহিঃপ্রকাশ। অন্য হাদিসে বলা হয়েছে যেঃ- খালাকাল্লাহু আদামা আলা সুরতিহি। অর্থঃ- আদমকে আমি আমার (আল্লাহ্) নিজ সুরতে তৈরী করেছি। অর্থাৎ আল্লাহ্র চেহারার অবয়বে। এই আদম সন্তান থেকে আমরা বণী আদমে রুপান্তর হয়ে আজকে দুনিয়াতে এত মানুষ।

এভাবে দুনিয়ায় যত নবী-রাসুল, ওলিগণ আছে সবারই মানব আকৃতিতে তাঁদের পাক জবানে আল্লাহ্র বাণী বা আল্লাহ্ময় অবস্থার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। আল্লাহ্ সরাসরি না বলে তাঁর মাধ্যম ব্যবস্থায় প্রকাশ করেছে তখনই তিঁনি দুনিয়াতে দন্ডণীয় হয়েছেন। এজন্য অনেক জ্ঞানীগণ বলে থাকেন যে, বাবা সত্য কোথায় পাবে! জবাবে বলিঃ- তুমি হকের উপর দাঁড়াতে চেষ্টা কর তাহলে সব বুঝতে পারবে। সত্য দূরে নেই, সত্য তোমারি ভিতরে।

এখন আপনার এত সার্কেল, এত লোক, এত নিকটজন, এত আত্মীয়স্বজন কোন কিছুই আর থাকবে না। তখনই বুঝতে পারবেন কে আপনার আপন আর কে আপনার পর। কারণ আপনিই তো আপনার না, তাই এত কিছু আপনার বলে মনে হয়েছে। যে দিন আপনি আপনার হবেন, সে দিন সমস্ত কিছু বা যারা আপনার এই মত আর পথের না, তারা একাই আপনাকে ডিভাইডেড করে ফেলবে। আর আপনি তখনই বুঝতে পারবেন যে কে আপনার আসল আপন। তাহলে আসল আপনার যেটা, সেটা আপনার ভিতরে রয়েছে। তাঁকে জাগরিত করে দেখেন না! জাগতিক একটি দেহ বা শরীর কেন্দ্রিক আশ্রিত ব্যবস্থা কাঠামোকে ধারণ করে আপনি বলেন যে, এইটাই আমার আপন। আসলে এগুলো আপন না। এজন্য মৃত্যু পরবর্তী কালীন অবয়ব কবর দিয়ে এটা উপলক্ষ্য হিসাবে বোঝানো হয়েছে যে, সেখানে কেউ কারো সাথে যায় না। এত যে আপন বা এত যে কাছের হলো, আসলে ঐ বেদনায় কেউই সম্পৃক্ত হয় না। তাহলে সেখানে আপনাকে আমাকে একাই ফিরে যেতে হবে। কিন্তু আপনার যেটা আপন ছিল ঐ আপনটা আপনার থেকে বের হবার সঙ্গে সঙ্গে আপনি লাশ হয়ে যাবেন।

যে সঙ্গে থাকে, এই থাকাতে এত বড়াই, এত কোদাই, এত বাহাদুরি। সকল বাহাদুরির মূল নিশানা যিনি সেইটা আপন কি না ? যিনি থাকলে আমার চৈতন্য থাকে, আমি জীবিত বলে আমার বাহাদুরি, আমার হাম্পাই। এই দিব্য দৃষ্টিতে জ্ঞান, ক্ষমতা, শক্তি আমার জীবনের শ্বাসটা যত সময় চলমান আছে, এই সময়ের মধ্যে তাঁকে ধরতে পারাটাই হলো সুফি আকিদার মূলকার্য।

তাই এই কার্যে যিনি সমাসীন হয়েছেন, তাঁর দ্বারা এই কথাতে বোঝা যায় যে, তিঁনি কারো সমতুল্য বা সমকক্ষ না বা মুখাপেক্ষী না। অর্থাৎ তাঁর সঙ্গে কারো সমন্বয় সাধন চলে না। এজন্য ওলি এবং মোর্শেদ প্রদত্ত ব্যবস্থার পথ, সেখানে আল্লাহ্‌র বহু ওলিরা এভাবে প্রমাণ রাখছেন। তাঁরা নিজেকে যে আল্লাহ্ বলে প্রমাণ করেছেন, এই কথাটা তাদের না। এই কথাটা হলো স্বয়ং আল্লাহ্‌র। এটাই প্রমাণ হয় এই আয়াতে কারিমার দ্বারা।

এই কার্য্যের দিকে মনোনিবেশ করে যদি কেউ কার্যকারিতা ফলাতে পারে, তবেই এই মূল ধারা সেটার প্রতিফলন বা ফলপসূ করতে হবে। এজন্য একজন গুরু বা মোর্শেদের কাছে গিয়ে তাঁর দেওয়া মোরাকাবা মোশাহেদার

মাধ্যম দিয়ে আপনার দেহ রাজ্যে যে অবাঞ্চিত ব্যবস্থাগুলো আছে, সেগুলোকে দূরিভুত করে আপন রুহ সত্ত্বার উদ্ভাসন রুপকে জাগ্রত করতে হবে। তাহলেই এই মূল ধারার কার্যকারিতা বা ক্রিয়াশীল হবে। এজন্য ইখলাস শব্দের অর্থ একত্ত্ববাদ বলা হয়। এই একত্ত্ববাদ বলতে একক, অখন্ড, অদ্বিতীয়, স্বয়ংভু সত্ত্বা। যার কোন বিভাজন নেই। অবিভাজনকৃত ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে একটি মানুষকে নির্মিত হতে হবে। সেই নির্মিত ব্যবস্থায় যেতে হলে দুনিয়াদারীর সকল আশ্রিত ব্যবস্থাকে নিজের ইচ্ছার কাছে কোরবানি দিয়ে, নিজেকে দন্ডায়মান হতে হবে। তাই দন্ডায়মানকৃত ব্যবস্থার মধ্যে নিজেকে নির্মিত করতে হলে প্রথমেই একটি গাইড বা একজন শিক্ষকের প্রয়োজন। একা একা দন্ডায়মান হওয়া যায় না, যার জন্য এই গুরুবাদ মাধ্যম ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

এজন্য এই প্রক্রিয়াতে যাবার যে সূচনা, সেই সূচনাটাই তো মোর্শেদ বা পীর। তাহলে সেই প্রক্রিয়াটাই যারা মানে না, তাদেরকে আপনি কি দিয়ে বোঝাবেন ? আসলে আমি আপনি কেউ কাউকে বোঝাতে পারব না। কারণ আমাদের ভাগ্য নির্ধারণ বা তকদির বলা হয়, সেটা যদি পূর্বেই নির্ধারিত থাকে তাহলে আমি আর আপনি কি দিয়ে বোঝাবো ?

এজন্য তকদিরকে যারা জয়লাভ করে তকদিরের কর্তৃত্ত্বের বলয়কে ছিন্ন করে যারা কামিয়াব হয়েছে। তাদের কর্তৃত্ত্ব দ্বারা কিছু মানুষকে হেদায়েতে আনা যায়। তাছাড়া যার যেটা লেখা আছে সেটা ঘটবে। এই ঘটা ব্যবস্থাকে তাঁরা হয়তো সুপারিশ করে সেটাকে সুসম্পন্ন করে। তাঁরা নতুন করে একটি আকিদাতে বা হেদায়েতের রাস্তায় নিয়ে আসে। হযরত মোজাদ্দেদ আল্-ফেসানী সিরহিন্দ (রহঃ) তাঁর মকতুবাদ শরীফের ১ম খন্ডে বলেছেন:- নেগাহে অলীমেঁ ইয়ে তাছির দেখি বদলতী হাজারো কি তাকদীর দেখি। অর্থ:- আল্লাহ্‌র ওলিদের নেক নজরের মধ্যে এমন তাছির রয়েছে যে! এক মুহূর্তে হাজারো তকদির পরিবর্তন হয়ে যায়। হযরত বাহাউদ্দিন নকশেবন্দী (রহঃ) বলেছেন:- মুর্শিদ একজন চিকিৎসকতুল্য। তিঁনি প্রয়োজন অনুযায়ী মুরিদদের রুহানী চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন।

এজন্য প্রতিটি মানুষকে মুরিদ হতে হবে। অর্থাৎ পীরের শিক্ষায় দীক্ষিত হতে হবে। অর্থাৎ একজন ওলিয়াম মুর্শিদের কাছে সারেন্ডার বা আত্মসমর্পন হতে হবে। এই ক্লাসটা হলো ধর্মের প্রাথমিক ক্লাস।

এই ক্লাসটা যদি সুসম্পন্ন না হয়, তাহলে তার ঈমান আনাই হলো না। ঈমান আনা যদি না হয় তাহলে কলেমার সনদ হয় না, আর কলেমার সনদ না হলে সে ধর্মে দাখিল হয় না। তরিকার জগতে এভাবে বলা রয়েছে। আর আমরা আনুষ্ঠানিকতা ধর্মের সাইনবোর্ড লাগিয়ে লেবাসে পরিচালিত হই ? এই উপ আনুষ্ঠানিক যে ব্যবস্থা, এটা আসলে ফকিরি না। ফকিরি হলো মানুষকে প্রকৃত মানুষ করবার যে মাধ্যম ব্যবস্থা, সেটা হলো ওলিদের নির্দেশিত ব্যবস্থার মাধ্যমে এটা তরান্বিত করতে বলা হয়েছে। তাহলে একজন ওলি বা মোর্শেদের কাছে বায়াত বা মুরিদ হলে তাঁর সহবতে থাকতে হয়, তাঁর দাসত্ব করতে হয়। এই দাসত্বের মাধ্যম দিয়ে নিজের মধ্যে অবাঞ্চিত যে শয়তানি স্বত্ত্বা বা মন্দ স্বত্ত্বার ব্যবস্থা রয়েছে, সেই মন্দ স্বত্ত্বাকে দূর করে আল্লাহ্‌র মূল স্বত্ত্বায় তরান্বিত করে এই একত্ত্ববাদ বা তৌহিদকে প্রতিষ্ঠা করবার তাগিদ করা রয়েছে। এই তাগিদ বা কার্যক্রম যদি ফলপ্রসূ হয় তাহলে এই সকল কিছু এক সময় গিয়ে কার্যকারিতার রুপ পাবে। তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে, প্রাথমিক স্তর হলো একটা ওলি বা মোর্শেদের কাছে বায়াত বা মুরিদ হওয়া। আমাদের দেখতে হবে ধর্মীয় দর্শনে মুরিদ হবার প্রমাণ আছে না কি ? অনেকেই বলে মুরিদ হওয়া যাবে, আবার অনেকেই বলে মুরিদ হওয়া যাবে না। তাহলে এর প্রমাণটা তো থাকতে হবে ?

প্রমাণ হিসাবে সংক্ষিপ্ত আকারে আপনাদের বলি, আল্লাহ্‌পাক কোরানুল মাজিদের সুরা কাহফ, আয়াত নাম্বার সতের। তার শেষ অংশে বলা রয়েছে:- ওয়ামা ইউদলিল ফালান তাজিদালাহুম ওলিয়াম মুর্শিদা। অর্থ তুমি পাইবে না তাদের জন্য কোন ওলি এবং মোর্শেদ যারা পথভ্রষ্ট। তাহলে যাদের ওলি এবং মোর্শেদ নাই সে পথভ্রষ্ট। সুরা আরাফের ১৮৬ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ্‌পাক বলেছেন:- যাদের পথ প্রদর্শক নাই সে পথভ্রষ্ট বিপথগামী। আয়াতে কারিমায় আল্লাহ্‌ পাক সুস্পষ্ট ভাবে বলে দিয়েছেন।

তাহলে আল্লাহ্‌র রাসুল (সঃ) এ বিষয়ে কি বলছেন ? রাসুল (সঃ) বলেছেন:- "যুগের ওলির কাছে বায়াত গ্রহন না করে যারা মৃত্যু বরণ করবে তাদের মৃত্যুটা হবে জাহেলিয়াতের মৃত্যু"। তাহলে আল্লাহ্‌র বাণীর সঙ্গে রাসুলের (সঃ) বাণী কত সামঞ্জস্যশীল বা তাৎপর্য্যপূর্ণ। এর অর্থ হলো যে, যুগের

প্রতিনিধিত্বের যে ধারা অর্থাৎ রাসুল (সঃ) পরবর্তী ব্যবস্থা ওলিদের যুগের কথা, এটা রাসুলের (সঃ) মুখ নিঃসৃত বাণীতে প্রমাণ হয়েছে। এই হাদিস খানা এসেছে হলো তিরমিযী শরীফের হাদিসে। রাসুলআল্লাহ্ (সঃ) মওলা আলীর (আঃ) এর হাত ধরে বললেন:- মান কুন্তুম মাওলাহু ফাহাজা আলীউন মাওলাহু (মেশকাত শরীফের ৫৮৪৪ নাম্বার হাদিস)। অর্থাৎ প্রতিনিধিত্বের ধারা রাসুলের (সঃ) হায়াতে জিন্দিগিতে জারিয়া করে গেছে। মনে রাখবেন এই হাদিস এবং কোরানুল মাজিদের আয়াতকে যদি আপনি মুসলিম হিসাবে জ্ঞাত হন, তাহলে অবশ্যই আপনাদের একজন ওলির কাছে বায়াত বা মুরিদ হতে হবে। যদি না হন এ স্বাধীনতাটাও আল্লাহ্পাক আপনাকে দিয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু আমরা এটা সম্পর্কে অবগত হয়েছি, জেনেছি, এই জানাটুকুই তো আপনাদের কাছে তুলে বা মেলে ধরছি। কার কাছে হবেন এটাতো বলা নেই। আপনার যাকে পছন্দ হয়,যাকে আপনি ওলি মোর্শেদ হিসাবে সমর্থন করতে পারেন তাঁর কাছে হবেন। নির্ধারিত করা নেই। তাহলে আপনার জ্ঞান-বিবেক, বিচার-বুদ্ধি এগুলো খাটিয়ে আপনার প্রতিনিধিটা সেই ভাবে নির্বাচন করুন। তার কাছে সারেন্ডার হবেন, বায়াত বা মুরিদ হবেন।

মুরিদ হওয়ার ভাষাকে সুফিদের পরিভাষায় বলা হয় আমানু অর্থাৎ কোরানুল মাজিদে আমানু সম্পর্কে যতগুলো আয়াত আছে, এই ঈমান আনবার পরে এই আয়াতের বাস্তবায়ন হলো তার কাছে থাকে। ওলিরা এই কোরানুল মাজিদের যে বাস্তবায়নকৃত রূপ, এই রূপগুলো আধ্যাত্মিক একটি প্রক্রিয়াতে ত্বরান্বিত করেন। এটা বস্তু মোহ ব্যবস্থায় জাগতিক ভাবে কোন কিছু তুলে ধরা হয় না। তাহলে আমরা জাগতিক ভাবে এটা উপস্থাপিত হলেই যে পরিপূর্ণতা পেলাম বা শুনলেই যে সেটা হয়ে গেল তা নয়। আজকে আমি আমার উপস্থাপন ব্যবস্থায় এভাবে মেলে ধরছি। আবার আরেক জন জ্ঞানীর উপস্থাপন ব্যবস্থা আরেক রকম হতে পারে বা আরও সুন্দর হতে পারে।

কারণ আল্লাহ্পাক কালামপাকে সুস্পষ্ট ভাবে এটা বলে দিয়েছে যে, এই দুনিয়ায় যত বৃক্ষরাজি আছে, সকল বৃক্ষরাজিকে যদি কলম বানানো হয় এবং যত পানি রয়েছে সকল পানিকে যদি কালি বানানো হয় তবুও কোরানুল

মাজিদের ব্যাখ্যা করে শেষ করা যাবে না। তাহলে এই বিশেষণে এক এক জনের এক এক রকম ভাবধারা। ব্যাখ্যা এক এক রকম হতেই পারে। কিন্তু নিজের আয়ত্ত্বকৃত ব্যবস্থাটা নিজেকেই কার্যকারিতার দিকে নি তে হবে।

তাহলে এটা রহস্যময় একটা ব্যবস্থা যে প্রতিটি বিশেষণ এক একটা একেক রকম ধারাতে স্থানান্তরিত হয়েছে। অপর আয়াতে বলা হয়েছে যে, সমগ্র কালিগুলো শেষ হয়ে যাবে, এই কলমে আবার আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কালিগুলো বানিয়ে দেওয়া হবে, আবার লিখতে লিখতে শেষ হয়ে যাবে। এই ভাবে ছয় বার তবুও এই কালাম পাকের গুণাগুণ লিখে শেষ করা যাবে না। আর আমরা সামান্য একটু পড়লেই সব জেনে যাই বা বুঝে যাই। এমন আহামরি ভাবখানা আমাদের বোকার বচন ব্যতিত আর কিছুই নয়। কারণ হলো এটা একটা রহস্যময় কিতাব। এই কিতাব সুফিদের আকিদায় বলা হয়, এটা নিজের দেহ রাজ্যে বাস্তবায়ন করতে হবে। এর প্রতিফলন উৎগীরণ করতে হবে। তবেই আপনার এই কালাম পাকের জালুয়া এবং কার্যকারিতার প্রতিফলন হবে। একটি হরফও যদি কোন দেহেতে বিকশিত হয় বা উৎগীরণ হয়, তাহলে এটার বাস্তবায়নে ঐ দেহটা কোন জাহান্নামের আগুন তাকে পোঁড়াতে পারবে না বা স্পর্শ করতে পারবে না। তাহলে এই কোরানকে আমরা সবাই জানি যে, এটা একটি সংবিধান। যাকে বলা হয় দ্যা কোড অফ লাইফ হলি কোরান। অর্থাৎ এই সংবিধানকে আমরা শুধু কাগজের পাতায় লিপিবদ্ধকৃত ব্যবস্থায় রাখলাম আর পড়লে সওয়াব এগুলোর মধ্যেই রেখে দিলাম। কিন্ত এর বাস্তবায়নকৃত ব্যবস্থার দিকে আমরা যাই না। যার জন্য এটার কার্যকারিতা হয় না। এজন্য প্রাথমিক স্তরটা শিখতে হলে একটি উছিলার মাধম্যে শিখতে হবে। এই উছিলাটা হলো একজন পীর বা মোর্শেদের কাছে দীক্ষিত হতে হবে বা মুরিদ হতে হবে বা বায়াত গ্রহন করতে হবে। এই বায়াত হবার পরে পীরের দেওয়া মোরাকাবা এবং মোশাহেদার অনুশীলন করতে হবে।

তাহলে আমরা এবার আসি দ্বিতীয় স্তরে মোরাকাবা এবং মোশাহেদা। তাহলে মোরাকবা মোশাহেদা কি রাসুলের (সঃ) আকিদায় ছিল ? এটা আমাদের দেখতে হবে। রাসুলের (সঃ) জিন্দেগীর ২৫ বছর সময় থেকে নবুয়্যত প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত ১৫ বছর ১ মাস ১৯ দিন জাবালুল নূর পর্বতে এই মোরাকাবা মোশাহেদায় লিপ্ত ছিলেন। মুসা (আঃ) তুর পর্বতে ধ্যান সাধনা করেছিলেন। বড় পীর আব্দুল কাদির জীলানী (রহঃ) ১৮ বছরের ধ্যান সাধনা গভীর জঙ্গলে

করেছিলেন। হযরত ওয়ায়েছ ক্বরনী (রহঃ) গভীর অরণ্যের মাধে ধ্যান সাধনা করেছেন। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এভাবে যত নবী-রাসুল, ওলিদের আগমন ঘটেছে তাঁরা সবাই এভাবে নির্জনে আল্লাহ্‌কে পাবার ধ্যান সাধানাস বা মোরাকাবা মোশাহেদা করেছেন। তারা জাগতিক বা রুপক কোন মসজিদে এই কার্য করেন নি।

তাহলে আমরা যদি উম্মতে মোহাম্মদী হয়ে থাকি, তবে কেন তাঁর সেই আমলটা এখন আমাদের ভিতরে কার্যকারিতা পায় না ? এর কারণ কি ? কারণ হলো এই আমল নীতি থেকে মানুষকে ডাইভার্ট বা সরানো হয়েছে। এই অনুশীলন কার্যকারিতা না পাওয়ার কারণে আমরা বিভিন্ন ভাবে নাজেহাল হই। কারণ এই মোরাকাবা মোশাহেদার মাধ্যমে একটি মানুষ কোরানুল মাজিদের এই প্রতিফলন বা বাস্তবায়নের রুপের যে ধারা সেটা একটি দেহেতে কার্যকারিতা পায়। তাহলে এই কার্য্যকারিতার আমল রাসুলের (সঃ) জিন্দিগিতে যদি আমরা একটু ভাববাদী ব্যবস্থায় অর্থাৎ মনে মনে যদি ভাবনাতেও আসি, তাহলে সবচেয়ে গুরুত্ত্বপূর্ণ যে সময়টা সেই সময়টাই উঁনি কিন্তু এই জাবালুল নূর পর্বতে কাটিয়েছেন। অর্থাৎ মা খাদিজাতুল কোবরার সঙ্গে বিবাহ বন্ধবে আবদ্ধ হওয়ার পর রাসুল (সাঃ) এই জাবলুল নূর পর্বতে অর্থাৎ হেরা পর্বতের গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকতেন। এটাকে বাংলাতে ধ্যান বলা হয় আর আরবিতে মোরাকাবা মোশাহেদা বলে।

তাহলে মোরাকাবা মোশাহেদা বাংলাতে যদি একটু বিস্তারিত বুঝতে চাই, তা হলো কাবায় মৃত্যু বরণ করা। অর্থাৎ এই কাবাটা একটি জ্যান্ত কাবাতে নির্ধারণকৃত ব্যবস্থার মধ্যে মৃত্যু বরণ করা। রাসুলের (সঃ) হাদিস শরীফে আসছে যে:- মওতা কাবলা আনতা মওতু :- অর্থ তোমরা মৃত্যুর পূর্বেই মরিয়া যাও। এই মরাটা কেমন ? তাহলে এই মরাটাই হলো সেই মরা যে, আমার দেহে সকল চৈতন্য ক্রিয়াশক্তি থাকবার পরেও এত কিছু থাকতে আসলে আমি মৃত একটি রুপ। আর এই মৃত রুপটাই কাবায় মৃত্যুবরণ করাকে মোরাকাবা বলে। আর মোশাহেদা হলো ধ্বেয় বস্তুকে সামনে রাখা। অর্থাৎ আমি যে উপলক্ষ্য, যে ভিউ বা যে চিত্রকে ধারণ করে আমার সেই ভজন সাধনকে জাগরিত করবার প্রচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছি সেটাকে ফলপ্রসূ করবার জন্য এই প্রচেষ্টা। তাহলে এই হলো মোশাহেদা অর্থাৎ ধ্বেয় বস্তুটা সামনে আনা অর্থাৎ কল্পনাকে বাস্তবায়িত রুপে প্রতিফলিত করা হলো মোশাহেদা।

এটাকে যদি আমরা বিজ্ঞানের ভাষায় বুঝতে চাই, তাহলে টেলিভিশন তো আবিষ্কৃত হয়েছে। এই টেলিভিশন আমরা বেশির ভাগ মানুষই দেখে থাকি। এই টেলিভিশন আবিষ্কার করেছেন হলো স্যার এলজন বেয়ার্ড। সংক্ষিপ্ত নাম হলো লেজি বেয়ার্ড বলা হয়। এই টিভি যিনি আবিষ্কার করেছেন তার এই আবিষ্কার সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণ তাকে প্রশ্ন করলেন বা তাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, আপনি এটা কি ভাবে সম্ভব করলেন ? তখন তিনি বললেন যে, প্রথমে আমি একটি মানব দেহ বা মেন্টাল বডি নিয়ে গবেষণা বা থিসিস করি। এই মানব দেহ নিয়ে দীর্ঘ সময় থিসিস করতে করতে এক সময় গিয়ে দেখি এটা রুপান্তর হয়ে গেল। এই রুপান্তরকৃত দেহটা যে আমি পেলাম সেটাকে আমি নাম দিলাম অস্ট্রাল বডি বা জ্যাতির দেহ।

অর্থাৎ রুপান্তরিত একটি রুপ। অর্থাৎ যে দেহটা, যে আকৃতিতে, যে ধারায় আমি নিয়েছিলাম সেটা আর ঐ ধারায় নাই। সেটা একটি আলোকিত ধারাতে জারিয়া হয়ে গেছে। তাই সেই আলোকিত ধারাকে যখন আমি পেলাম তখন আমার মধ্যে কৌতুহল এলো। অর্থাৎ থিসিস সম্পর্কে বুঝাতে আজকে বিজ্ঞানের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হলো এই কম্পিউটার, কম্পিউটার থেকে এই মোবাইলের আবিষ্কার।

তাহলে এটা দীর্ঘকাল গবেষণার মাধ্যমে এটা আবিষ্কার হয়। থিসিসেরই একটি রুপ যখন যান্ত্রিক উপায়ে আমাদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছে তখন পন্য হিসাবে আমরা ব্যবহার করি। তাহলে যিনি তৈরী করেছেন তাকে এই সাধনা গুলি করতে হয়েছে। না কি একা একা এটা মানুষের কাছে এসেছে ? ওটা থেকে নিয়ে মানুষ বিভিন্ন কোম্পানিতে তৈরী করে মার্কেটে ছাড়ে। তাহলে যিনি আবিষ্কার করেছেন ওইটা হলো মূল। আর যত ভুল-ভাল, রং-ঢং শৈলিতে যত কোম্পানি বানিয়েছে, যার যার কোম্পানির লোগো দিয়ে সেটা তারা মার্কেট বা বাজারজাত করে। একটু ভিন্নতার আলোচনা এসে গেল।

যাই হোক তাহলে এই মেন্টাল বডিটাকে যখন তিনি স্থানান্তরিত করল তখন সেটা অস্ট্রাল বডি হয়ে গেল। তখন উনি বললেন যে, এই অস্ট্রাল বডিটাকে নিয়ে আমি আরও দীর্ঘ সময় আমার মধ্যে কৌতুহল যে, এটার আরেকটি রুপ কি হতে পারে বা এটার পরিবর্তন হয় কি না ! আমি আরও গভীর থিসিসে মনোনিবেশ করলাম।

এই মনোনিবেশ করার পর আমি দীর্ঘকাল অতিবাহিত হবার পর আমি দেখতে পেলাম যে, এটা আরেকটি চূড়ান্ত রুপান্তর আকৃতিতে ফলপ্রসূ হয়ে গেল। সেই ফলপ্রসূ রুপটার নাম দিলাম হলো অকেশনাল বডি। অর্থাৎ নিমিত্ব দেহ।

তাহলে তিনটি স্তর অর্থাৎ এই অকেশনাল বডিটাই সৃষ্টিরাজ্যে বিচ্ছিরণকৃত অর্থাৎ এটা যেতেও পারে ফিরে আসতেও পারে। অর্থাৎ একটি টিভির যদি মনে করেন যে, আজকে সারা পৃথিবীতে যদি দুই কোটি টিভি থাকে এবং সেখানে যদি সোনি চ্যানেল থাকে, তাহলে সোনি চ্যানলে যেটা ছাড়বে দুই কোটি টিভিতেই সেটা দেখা যাবে। আসলে মূল অনুষ্ঠান কিন্তু এক জায়গাতেই হয়।

তাহলে এই মোরাকাবা মোশাহেদার মূল কার্য্য হলো, আসলে আমাদের একের যে মূল ধারার নিশানা বা চাওয়া, অর্থাৎ ধর্মীয় আঙ্গিকে যদি আমরা বুঝতে চাই যে, সবার মূল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ্‌কে চাওয়া বা আল্লাহ্‌কে লাভ করা বা তাঁর দর্শন লাভ করা। তাহলে এই মোরাকাবা মোশাহেদার মাধ্যমে এই মূলকে হাজির নাজির করা। এই মূল যখন বিচ্ছুরণকৃত অবস্থায় শক্তি পায় বা এজাযত পায় তখন সে বিচ্ছুরণকৃত ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে ত্বরান্বিত হয়। যেমনঃ- যার কথা না বললেই নয়, বড় পীর সাহেব আব্দুল কাদের জীলানী কয়েকজন ভক্তের বাড়ীতে একই সময় রোজার দিনে ইফতার সম্পন্ন করেছিলেন। কিভাবে করেছিলেন ? তাহলে এই বিচ্ছুরণকৃত ব্যবস্থায় অর্থাৎ যিনি এই প্রক্রিয়াতে ত্বরান্বিত হয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করে, তার দ্বারা এই কাজটা সম্পন্ন হয়। এভাবে এই দর্শন বা মোরাকাবার মাধ্যম দিয়ে একটি মানুষ প্রকৃত স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ করে। তাই স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ করবার পরে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যদি তাকে দুনিয়াতে ধর্মীয় দর্শনের প্রতিনিধিত্ব দান করা হয়, এই তিঁনিই আল্লাহ্‌র ধর্মীয় প্রতিনিধি হন।

এভাবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রতিনিধি এসে ধর্মকে ধারণ করতে শিখিয়ে যায়। এই শিক্ষায় কিতাবের কোন জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক এগুলো কাজ করে না। এখানে এটার কোন মূল্য নেই। এজন্য এক লক্ষ চব্বিশ হাজার মতান্তরে দুই লক্ষ ছত্রিশ হাজার নবী, রাসুল, পায়গাম্বার যারা এসেছেন, তাঁরা কেউ-ই কলেজ, ভার্সিটি, মাদ্রাসা এগুলোতে লেখা পড়া করে ধর্মকে শিখায়নি তারা এই আধ্যাত্মিকতার বলয় বা মোরাকাবা মোশাহেদার মাধ্যমে নিজেদেরকে আত্ম

জাগরণ করে, কালামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। কিভাবে একটি দেহকে কিতাবে পরিণত করতে হয় সেই সুশিক্ষা দিয়ে ধর্মকে ধারণ করতে শিখিয়েছেন। এই ধারার শিক্ষাগুলো ওলিরা দিয়ে থাকেন। তাহলে চলমান আমরা যে সকল প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান দ্বারা এটাকে বিশ্লেষণ করে বা মোডিফাই করে সকল কিছু বুঝতে চাই। কিন্তু এটা লেখাপড়ার কোন জ্ঞান নয়। এটাকে বলা হয় ওলিদের ভাষায় এলমে লাদুনী অর্থাৎ এটা সৃজনকৃত জ্ঞান বা সীনা হতে সীনার জ্ঞান।

তাহলে একটি মানুষকে সৃজিত হতে হবে। তাহলে এই সৃজিত করবার যে প্রণালী সেই প্রণালীর দুইটি স্তর, এক হলো একজন ওলি বা মোর্শেদের কাছে বায়ত বা মুরিদ হওয়া, দুই হলো মোরাকাবা মোশাহেদার মাধ্যমে নিজেকে মুক্ত লাভ করা বা পরিপূর্ণতার দিকে নিয়োজিত করা। তাহলে এইটা সফল হলে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে জারিয়া হয়। এই জারিয়াকৃত ব্যবস্থা হলো একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত।

তাহলে আল্লাহ্ সবাইকে জারিয়া করে দিলে তো হয়েই গেল। কিন্তু এটা তেমন বিষয় না। এ বিষয়ে আল্লাহ্‌পাক তাঁর কালামপাকে বলছেন যে:- ইয়াদু আল্লাহু লিনুরিহি মাইয়া শাউ। অর্থ:- যখন যাকে খুশি তিঁনি তাঁর দিকে নিয়ে নেন। তাহলে এই যাকে খুশি আল্লাহ্ নিয়ে নেন, সবাইকে নিয়ে নিলে তো হয়েই গেল। তাহলে আল্লাহ্ যে নেন না, তাহলে তিঁনি দোষ করে না ? আল্লাহ্ দোষী না ? কিন্তু এটা তা নয়, বোঝাটা আমাদের জন্য হিতে বিপরীত হয় বা ভিন্নতার মাত্রায় আমরা বুঝার জন্য এরকম দৃষ্টি ভঙ্গির উল্টাপাল্টা হয়। মূলকে বুঝতে হলে দৃষ্টি ভঙ্গিকে বদলাতে হবে সব সময় পজিটিভ ভাবতে হবে। তো পজিটিভ ভাবনাটা হলো এমন যে, আল্লাহ্ যে নিয়ে নিবেন সেই নেওয়ার মতো একটা যোগ্যতা আমার মধ্যে রয়েছে কি না! সেটাও তো বুঝতে হবে।

দুনিয়ার জিন্দিগিতে জাগতিক ভাবে আপনি যদি একটি কর্মে লিপ্ত হতে যান, তাহলে সেই কর্ম সম্পর্কে আপনার জানা থাকলে আপনাকে তারা স্বাদরে গ্রহন করবে। আর সেই কর্ম সম্পর্কে আপনার জ্ঞান না থাকলে তারা কেউ আপনাকে নেবে না। তাহলে আল্লাহ্ যে তাঁর দিকে নিয়ে নিবেন সেই গুন ক্ষমতা বা যোগ্যতায় ত্বরান্বিত তো হতে হবে, তবেই তো তিনি নিবেন। না হলে তাঁর নেওয়াটাও আমরা বুঝি না, তাঁর দেওয়াটাও আমরা বুঝি না।

অর্থাৎ কাঁনা। এজন্য সাধক বাউল লালন সাঁইজি বলেছেন যে:- "এক কাঁনা কয় আরেক কাঁনারে, চলো রে যাই মন ভব পারে, নিজেই কাঁনা পথ চিনে না পরকে ডাকে বারং বার, এ সব দেখি কাঁনার হাট বাজার"। এই কাঁনার হাট বাজারের মত আমাদের ধর্মীয় দর্শন এখন মুখস্থ বিদ্যার উপর জারিয়া হয়ে গেছে।

যদি মোরাকাবা মোশাহেদা করতে বলা হয়, তাহলে মুসকি হাসি দিয়ে মানুষকে ব্যাঙ্গ করতে দেখা যায়। আর যারা এটাকে আঁকড়ে ধরতে সচেষ্ট হয়, তাদেরকে বিভিন্ন ভাবে লাঞ্চনা গঞ্জনা দিয়ে বিতাড়িত করবার উপক্রম করা হয়। তাহলে কি দিয়ে ধর্মীয় দর্শন দাঁড়াবে ? কিন্তু সত্য কখনও পিছু পাঁ হয় না। সত্য শত আঘাত গঞ্জনার মধ্য দিয়ে যে কেউ এটার উপর নিজেকে স্বক্রিয়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকতে পারে এবং তার পীর বা মোর্শেদের নির্দেশক্রমে মোরাকাবা মোশাহেদা চালিয়ে যায়, তাহলে সে সত্য লাভ করতে পারে। এজন্য পীর বা মোর্শেদ বড় না, বড় হলো সত্য লাভ করা। তাহলে এই সত্য লাভ করতে হলে অবশ্যই এই আকিদার মধ্যে আমাদের নিহিত হতে হবে।

তাহলে রাসুলের (সঃ) আকিদায় সবচেয়ে মূল্যবান সময় ছোট শিশু থেকে শুরু করে ২৫ বছর পর্যন্ত নিজেকে আল আমিন বা সত্যবাদী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠত করেছিলেন। তাহলে যৌবনের উন্মাদনা তাঁর মধ্যে সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী যে ক্রিয়া সেটাইতো ২৫ বছর। অতঃপর ২৫ বৎসর থেকে ৪০ বৎসর বা নবূয়্যতির পূর্ব পর্যন্ত তিঁনি হেরা গুহায় ধ্যান সাধনার মাধ্যমে নবূয়্যতি লাভ করলেন। এই সময়টা তাঁর জীবনে সবচেয়ে মূল্যবান সময়। এই সময় হেরা গুহায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। রাসুলের (সঃ) হায়াতের জিন্দিগি সম্পর্কে জাহেরি জগতে যেটা প্রকাশিত রয়েছে সেটা হলো ৬৩ বছর আমরা সবাই জানি। তাহলে তার মধ্য থেকে আপনি ২৫ বছর উপন্নিত হবার যে সময়টা সেইটা সবচেয়ে মূল্যবান সময় কি না একটু ভাববেন ?

এই মূল্যবান সময় মা খাদিজাকে রেখে উনি জাবালুল নূর পর্বতে বা হেরা পর্বতের গুহায় মোরাকাবা মোশাহেদাতে পরিগমন করেন। তাহলে এই আমল নীতিতে আজকে আমাদের সমাজে কার্যকারিতা নেই। দুনিয়ার জিন্দিগির কোন

দেয়ালের উপর আমরা দাঁড়িয়ে আছি ? এগুলো আমাদের মধ্যে কার্য্যকারিতা বা ফলপ্রসূ পায় না। এজন্য এ বিষয়গুলো বিভ্রান্তির দিকেই রয়ে যায়।

তাহলে এই মূল্যবান সময় আপন বিবিকে রেখে মোরাকাবা মোশাহেদা বা এই ধ্যান সাধনার কার্যসম্পন্ন হয়েছে। আজকের জামানায় যদি কোন সন্তান এরকম কার্যকরে, তার স্ত্রী বা তার বাবা-মা কী অনুমতি দেবে বলেন ? তাহলে ধর্মটা কত ক্রিটিক্যাল এবং কত শক্তিশালী আবরণকৃত বলয় দ্বারা এটাকে ঘিরে রাখা হয়েছে। যে বলয় থেকে আমরা আর সহজে বের হতে পারছি না, মূল ধারাকে আর বুঝতে পারছি না। এজন্য নবুয়্যতি বা প্রতিনিধি লাভ করবার যে প্রক্রিয়া, সেই অনুশীলন বা মোরাকাবা মোশাহেদা গুলো যদি কেউ করে থাকে, তাহলে সে বুঝতে পারবে যে সত্যের জালুয়াটা কিভাবে প্রজ্জ্বলিত হয় বা সত্যের কার্যকারিতা কেমন হয়?

অর্থাৎ দুইটি আমল। মনে রাখবেন রাসুলের জিন্দিগিতে জন্ম লাভের পর থেকে ২৫ বছর পর্যন্ত একটি মাত্র আমলে জারিয়া ছিল। সেটা হলো নিজেকে ২৫ বছর পর্যন্ত আল-আমিন বা সত্যবাদী বলে সবার কাছে উপস্থাপিত হয়েছিলেন। অর্থাৎ আব্দুল্লাহ্‌র ছেলে মোহাম্মদ (সঃ) সত্য কথা বলে দ্বিতীয় আর কোন আমল তখন আসেনি। তাহলে এই যে আমল নীতিটা, এই আমল নীতিটা আমার আপনার সবার জন্য একটি প্রয়োগ পদ্ধতি করেছেন। আর দ্বিতীয় হলো:- ১৫ বছর ১ মাস ১৯ দিন সময় অসময়ে উঁনি ধীরে ধীরে একাকিত্বে অর্থাৎ সেই ২৫০০ ফুট উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় একাকিত্ব ভাবে মোরাকাবা মোশাহেদায় লিপ্ত ছিলেন, সেই আমলের দ্বারাই উঁনি নিজের পরিশুদ্ধতা লাভ করেছিলেন। আর এগুলো আমাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যই করেছিলেন।

জাবালুল নূর পর্বত বা হেরা পর্বতের গুহায় জিবরাঈল আমিনের আগমন ঘটে। তাহলে জিবরাঈল আমিন এসেছে এটা নগদ। জিবরাঈল আামিনকে যে রাসুল (সাঃ) দেখেন কিন্তু রাসুলের সাহাবারা তাকে দেখে না। কেন ? কারণ তারা বেশির ভাগই এই আমলটা করে নি। তাহলে আজকের দিনে আপনি এই আমলটা করলে এর হাকিকত বা এর যে একটি রহস্যময় ঘটনা গুলি রয়েছে এটা বুঝতে পারবেন।

এজন্য ওলিরা তাগিদ করে মোরাকাবা মোশাহেদার। কিন্তু মানুষ এদিকে যেতে চায় না। কারণ এটা কষ্ট সাধ্য ব্যাপার। তাহলে এটাকে বুঝতে হলে অবশ্যই আপনাকে এই প্রক্রিয়ায় যেতে হবে। তাহলে কোরানুল মাজিদের আয়াত জিবরাঈল আমিন এনে রাসুলকে (সঃ) দিলেন, তাহলে সেটাও তো সেই হেরা পর্বতের গুহায়। মক্কা, মদিনা কোথাও কিন্তু প্রথমে এই আয়াতে কারিমা জারী হয় নি। যদি জারী হয়ে থাকে তাহলে সেই সাধনার অর্থাৎ রাসুলের (সঃ) মোরাকাবা মোশাহেদার স্তরেই কোরানুল মাজিদ পেয়েছেন।

তাহলে এটা নগদ পেয়েছেন, জিবরাঈল আমিনের দর্শন সেটাও নগদ। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাঁকে নবুয়্যতের সনদ করা হয়েছে, সেটাও নগদ। ধর্মীয় দর্শনের মূল আকিদা গুলো যদি নগদ হয়, তাহলে আমি আপনি কেন বাকির লোভে এভাবে থাকি ? তাহলে এই নগদের যে ধারার আমল নীতি গুলো আছে, সেই নীতি গুলো অনুযায়ী একজন কামেল ওলি বা মোর্শেদের স্মরণাপন্ন হয়ে তার দেওয়া আমল গুলো বাস্তবায়নের দিকে ধাবিত হবার জন্যই আল্লাহ্‌ এবং তাঁর প্রতিনিধিগণ বলে গেছেন। এই অনুশীলন বা কারিকুলাম বাস্তবায়নে পূর্ণতা লাভ করলে ধর্ম সম্পর্কে আপনাকে কেউ ধোঁকা দিতে পারবে না। কারো স্মরণাপন্ন হতে হবে না, কারো দারস্ত হতে হবে না। মূল ধারার বিষয় গুলো এমন।

এজন্য মূল বিষয় গুলো সম্পর্কে এই ইখলাস পয়দা হওয়ার ব্যাপারে আমি হয়ত আপনাদের মাঝে একটু তুলে ধরলাম। এজন্য ওলি বা মোর্শেদের কাছে আত্মসমর্পন করতে হয়। এটা কার্যকর না পাওয়ার যে বন্ধন, এই বন্ধনটা হলো আমরা বলে থাকি সুফি ভাষায় মন্দ সত্ত্বা বা শয়তান। কাম, ক্রোধ, অহংকার, লোভ, মোহ, মাৎসর্য্য এগুলোকে পরিত্যাগ করতে হবে, মন্দ সত্ত্বার শিঁকলে বন্দি হৃদয়ে স্রষ্টার দর্শন হবে না। কোরান, হাদিসে যত উপদেশ আছে মূলত এই মন্দ বা শয়তানি সত্ত্বাকে বিতাড়িত করে আল্লাহ্‌র রঙে রঞ্জিত হবার জন্য তাগিদ করা হয়েছে। অর্থাৎ স্রষ্টার সাথে লীন হবার জন্য এই সকল বিধি-বিধান।

আল্লাহ্‌পাক কালামপাকের পৃথক পৃথক আয়াতে মন্দ সত্ত্বা বা শয়তানি সত্ত্বা সম্পর্কে বলছেন যেঃ-

১) আউযুবিল্লাহি মিনাস শয়তানির রাজিম।
অর্থঃ- বিতাড়িত বিদ্রোহ শয়তান হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।
২) ফাসাযাদু ইল্লাহ্ ইবলিস।
অর্থঃ- সবাই সেজ্‌দা দিল একমাত্র অহংকারী সেজ্‌দা দিল না।
অর্থাৎ ইবলিস সেজ্‌দা দেয় না।
৩) আত্তালে বুদ্দুনিয়া মরদুদ।
অর্থঃ- যে কেবল দুনিয়া চাইল বলে দাও সে মরদুদ নামে শয়তান।
৪) মিনশার্‌রিল ওয়াসওয়াসিল খান্নাস।
অর্থঃ- তুমি খান্নাসের কুমন্ত্রণা থেকে মুক্ত নাও।

তাহলে কোরানুল মাজিদের ভাষায় শয়তানের চারটি রুপ। যথাঃ- শয়তান, ইবলিশ, মরদুদ, খান্নাস। এই চারটি সত্ত্বাকে একত্রে প্রচলিত ভাষায় এক কথায় শয়তান বলা হয়।আল্লাহ্‌পাক মন্দ সত্ত্বা বা শয়তান সত্ত্বাকে এই চারটি নাম বা চারটি লকব বা চারটি খেতাবে আলাদা আলাদা ভাবে পৃথক আয়াত জারী করেছেন। আর আমরা শয়তানকে শুধু শয়তান বলে থাকি কিন্তু আল্লাহ্‌পাক তা বলেন নি। তাহলে আল্লাহ্‌র কথা আর আমাদের কথা কম/বেশি হয়ে যাচ্ছে। তাহলে এই পৃথক পৃথক যে ব্যবস্থা, সেই ব্যবস্থার দ্বারাই এই আমাদের মধ্যেই শয়তান বাইরে নেই। প্রতিটি মানুষের ভিতরেই শয়তান বা মন্দ সত্ত্বা রয়েছে।

যখন রাসুল (সঃ) বললেন, প্রতিটি মানুষের মধ্যেই শয়তান রয়েছে। তখন এক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসুলআল্লাহ্ (সঃ) তাহলে আপনার সঙ্গেও কী ? আল্লাহ্‌র রাসুল (সঃ) বললেন হ্যাঁ, আমার সঙ্গেও একজন শয়তান ছিল তাকে আমি মুসলমান বানিয়ে ফেলেছি। তাহলে এই শয়তান মুসলমান হলে আমি মুসলমান। এজন্য আল্লাহ্‌পাক সুরা বাকারার ১৩২ নাম্বার আয়াতে দেখিয়ে দিলেন যে নবীর ঘরে জন্ম নিলেই মুসলমান হয় না, মুসলিম হতে হয়। তাই এই আয়াতে ইব্রাহিম (আঃ) তাঁর সন্তানদের মুসলমান হবার জন্য এবং ইয়াকুব নবীও (আঃ) তাঁর সন্তানদের মুসলমান হবার জন্য তাগিদ করছেন। অথচ আমরা জন্মগত ভাবে বাবা মা মুসলিম সেই ওরসজাতে দুনিয়াতে এসে মুসলিম দাবি করি। এটা জন্মগত মুসলিম কিন্তু আল্লাহ্‌র প্রকৃত বিধানের যে মুসলিম সেই মুসলিম নিজেকে হতে হয়। আর এই মুসলিম স্বত্ত্বা হলেই সকল কিছুর পরিপূর্ণতা ফলে, ধর্মের কার্যকারিতা পায়।

এজন্য ধর্মের কার্যকারিতার মূল যে কাজ সেটাই হলো এই মন্দ স্বত্ত্বা থেকে উত্তোরণ। অর্থাৎ শয়তানি স্বত্ত্বা থেকে নিজেকে বাহির করতে হবে। তাহলে এই শয়তানি স্বত্ত্বা থেকে বাহির হতে হলে কি করতে হবে সেই প্রক্রিয়া গুলো ওলি বা পীর মোর্শেদ দিয়ে থাকেন। দুনিয়ার কোন স্থাপত্যে এটা রাখা নেই যে অমুক জায়গায় জীবন্ত শয়তান আছে। শুধু রুপক আকারে মক্কায় রাখা রয়েছে, ছোট, বড় এবং মেজ শয়তান। কারণ এই শয়তান কোথায়ও আঘাত করে না, শুধু এই মানুষের মনে বা হৃদয়ে। এই হলো তার অবস্থানের জায়গা। আর কোথায়ও থাকবার অধিকার তাকে দেওয়া হয় নি।

আবার আল্লাহ্পাক এই হৃদয়ে বা ভিতরে অবস্থান করে। তাহলে উভয়ের স্থানের জায়গাা একই। কিন্তু আসলে একটা থাকলে অপরটা হয় না। যদি নেগেটিভ থাকে তাহলে পজিটিভ অকার্যকর আর যদি পজিটিভকে কার্যকরি করতে হয়, তাহলে নেগিটিভকে অপসারণ করতে হয়। এই হলো একটি প্যাঁচ। এই নেগেটিভকে যদি অপসারণ না করতে পারি তাহলে আমার আর মুসলিম হওয়া হলো না, এটা নামের মুসলিম। উপ আনুষ্ঠানিকতার উপর কিছু আমল নীতি আর কিছু পোশাকই সভ্যতার আলোকে এই ডিজাইন করে আমি দুনিয়াতে দেখিয়ে চলে গেলাম যে, আামি একজন আমলদারি বা মুসলমান। আসলে কাঁনা হয়ে ফিরে গেলাম। আল্লাহ্পাক বলছেন যে, যে দুনিয়াতে অন্ধ থাকবে সে পরকালেও অন্ধ থাকবে। এই অন্ধ অর্থ চোখ কাঁনা না, এই অন্ধ হলো চৈতন্য ধারাকে জাগরণ করে না দেখার অন্ধ।

তাই এজন্য দর্শনবাদে হলো ধর্মের পূর্ণতা। আজ অনেকেই দর্শনবাদ মানে না এটা সত্যিই কষ্টের। কারণ তার জ্ঞান বা তার যে আকিদা মেধা সেটা ভিন্ন খাতে প্রভাবিত হচ্ছে। এজন্য সে মানে না। কিন্তু ধর্মীয় সকল দর্শন সুফিদের আকিদার ভিত্তিতে এটা জারিয়া হয়েছে বা চলমান রয়েছে। তাই সেই প্রক্রিয়াগুলো বাস্তবায়ণের জন্য এই চারটি স্বত্ত্বা, যদিও আমরা একত্রে নাম শয়তান বলে থাকি। এই শয়তানি সত্ত্বাকে দূর করে মুসলান হবার প্রক্রিয়ায় প্রথমে একজন কামেল ওলি বা মোর্শেদের কাছে সারেন্ডার হতে হবে। এরপর সুফিদের বা ওলিদের মূল আমল নীতি হলো তাসাব্বুরে শায়েখ।

অর্থাৎ একজন পীর বা মোর্শেদের কাছে যখন একজন মুরিদ বা বায়াত হয়, তখন তাকে যে আমল নীতিতে দাঁড় করানোর জন্য যে প্রচেষ্টা করা হয়, সেটাই হলো তাসাব্বুরে শায়েখ।

তাসাব্বুরে শায়েখ কী ? অর্থাৎ এই হাত আর আমার নেই, এই হাত আমার মোর্শেদের হাত, এই চোখ দিয়ে আমি আর দেখি না, এই চোখ দিয়ে আমার মোর্শেদ দেখেন, এই মুখ দিয়ে আমি আর কথা বলি না, এই মুখ দিয়ে আমার মোর্শেদ বলেন। এভাবে সর্ব অঙ্গ বা দেহটাকে যদি রুপান্তর বা স্থানান্তরিত করা যায়, সেটাই হলো তাসাব্বুরে শায়েখ।

শয়তান কোন কর্মে বন্ধন তৈরী করে না কিন্তু এই কর্ম যখন একটি মানুষ করতে যায় তখন সে উপলব্ধি বোধ দ্বারা বুঝতে পারে যে, সকল আমলে বন্ধন তৈরী হয় না, অথচ এই তাসাব্বুরে শায়েখ করতে গেলে কেন এটা পারি না ? এই উপলব্ধির কারণে দীর্ঘ সময় মোর্শেদের নিকটবর্তী সহবতে থাকতে হয়, তার দেয়া আমল নীতি গুলো আঁকড়ে ধরে তিল তিল করে এই নিজের দেহ ভান্ড থেকে ঐ সকল অপশক্তিকে বা মন্দ সত্ত্বাকে অপসারিত করলে, সে কামিয়াব হয়।

তাসাব্বুরে শায়েখে থাকতে থাকতে যখন মন্দ সত্ত্বা দূর্বল হয়ে যায়, তখন মন্দ স্বত্ত্বা আর কাজ করতে পারে না। এই মন্দ সত্ত্বাকে যদি আপনি ধরতে পারেন, এই ধরা দিলে তাকে যদি কলেমা পড়িয়ে মুসলমান করতে পারেন, তাহলে সে আর এই বিদ্রোহ বিড়ম্বনা বা স্রষ্টামুখী কতৃত্বের উপর বন্ধন তৈরী করতে পারে না। তাহলেই সে মুসলিম হিসাবে পরিগনিত হয়। তার সকল কার্য ফলপ্রসূর দিকে ধাবিত হয়। তখন পজিটিভ বা মওলা সত্ত্বা কাজ করে।

আর আমরা যারা প্রতিনিধিত্ব করি এটার জন্য আরও উচ্চ স্তর। কারণ এটার স্বীকৃত সনদ লাগে। এটার সনদ যদি না হয়, তাহলে এটা কার্যকারিতা পায় না। এজন্য মূল ধারার বিষয় সম্পর্কে যদি আমরা জানতে চাই বা বুঝতে চাই বা এই সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে চাই, তাহলে অবশ্যই এই চ্যাপ্টার গুলো বাস্তবায়ন করতে হবে। কথা দিয়ে কোন কিছু হয় না যদি কার্যকারিতা না ফলে।

এজন্য বড় পীর সাহেব উনি বর্ণনা করেছেন যে:-

"যখন তুমি কোন পীরের নিকট গমন কর
তখন জাহেরি বিদ্যাকে পরিত্যাগ করে যেও"

কারণ জাহেরি বিদ্যাটায় যদি সকল কিছু হয়ে যেত, তাহলে তোমার পীরের নিকট গমন করবার বা কিছু শিখতে যাওয়ার প্রয়োজন হত না। মওলানা জালাল উদ্দিন রুমি বর্ণনা করেছেন যে:-

"কোরান কিতাব যা কিছু আছে সব পানিতে ফেলে দাও
ওখানে আল্লাহ্ নেই।
আল্লাহ্কে যদি পেতে চাও তাহলে তুমি শামসেত্ত্বাব্রিজের গোলামি কর"

অপর বাণীতে মওলানা জালাল উদ্দিন রুমি বর্ণনা করেছেন যে:-

"কোরানের তাফসির যদি কোরান হত বা হাকিকত হত
তাহলে রুমিকে শামসেত্ত্বাব্রিজের কাছে যেতে হত না
কারণ রুমি একাই কোরানের তাফসির লিপিবদ্ধ করতে পারে"

তাহলে এই জ্ঞান, এই ধারাবাহিকতা একটু ভিন্নতা। এজন্য এই ধারাবাহিকতার এই প্রয়োগ পদ্ধতি। এই মূল ধারার বিষয় সম্পর্কে কথা কম। যারা সাধক পর্যায়ে এ সমস্ত বিষয়ে নিয়ে অ্যানালাইসিস করে বা রিয়াযত করে কার্যকারিতা করার জন্য প্রচেষ্টা করে। তাদের কাছে এই কথা গুলো একটা বন্ধন হয়ে যায়। কারণ কথা দিয়েতো আসলে এগুলো বোঝানো যায়, কিন্তু দেখানো যায় না। এটাই কষ্টের হয়ে যায়। এজন্য সাধকদের মূল কার্য কারিকুলাম থাকে ভাববাদী ব্যবস্থাকে ত্বরান্বিত করা।

এজন্য ওলিদের মাহফিলে আমরা দেখে থাকি সামা, কাওয়ালি বা বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের তালের সাথে মাস্তির হালে নাচছে। কারণ মূল ধারার জাগরণকৃত ঐশি যে ব্যবস্থা, সেই ব্যবস্থাকে আনায়ন করবার জন্য বা সেই ব্যবস্থাকে দৃষ্টিপট বা বিতরণ করবার প্রচেষ্টাতেই আনুষ্ঠানিকতা গুলো হয়। এটাকে হয়ত জাগতিক বিধি বিধানের আলোকে আমরা অনেক রকম মন্দের মূর্ছনায় বলাবলি করে থাকি। কিন্তু এটা ঠিক না। এটা যে আমরা বুঝতে পারিনা, এই কথা আমরা কোন দিন স্বীকার করি না। এটাই হলো আমাদের এক ধরণের শয়তানি ধোঁকা। বাবা শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জেশেখর (রহঃ) বলেছেন:- অনুমানের উপর কথা বলে দিলকে শয়তানের খেলার পুতুল করা উচিৎ নয়।

সক্রেটিস বলেছেনঃ- প্রশ্নে ভরা দুনিয়া। জ্ঞানীরা কনফিউজড। বুঝতে পারা সম্ভব না, তা যখন বুঝবেন, তখনই প্রজ্ঞার সাক্ষাৎ পেলেন। বোকাদের কাছে উত্তর বেশি থাকে।

এজন্য সবাই চেষ্টা করবেন, যে আলোচনাটুকু করলাম, এই আলোচনার উপর অন্তত কার্যকারিতা ফলাবেন। যদি কার্যকারিতা না পায়, দিনভর জন্ম লাভের পর থেকে যে পর্যন্ত আপনার জ্ঞান হয়েছে, তখন থেকেই ধর্মের এরকম কথা আমরা শুনি। কিন্তু বাস্তবায়নের দিকে নিজেদেরকে নেই না। যার কারণে আমাদের পূর্ণতার ফলপ্রসূ বা কার্যকারিতা হয় না।

তাই যে আলোচনাটুকু রাখলাম, সেটা কার্যকারিতা করবার জন্য চেষ্টা করবেন। তাহলে এই সকল কিছু সহজ হবে এবং মান্যতার ধর্মটাই হলো বড়। জানা সহজ, মানা কঠিন। কারণ ইসলাম সম্পর্কে যে ধারণা গুলো আমরা কিতাবে বা দলিলে উপস্থাপন দেখি, তাহলে তার বাস্তবায়ন যদি নিজেরা না করি, তাহলে এর স্বাদ হবে না। এটা শুধু কথার মধ্যেই থেকে যাবে। তাহলে আমাদের ধর্মের পালনকৃত ব্যবস্থাটা হবে রুপক। কিন্তু ধর্ম রুপক নয় ধর্ম হলো হাকিকত অর্থাৎ এর ভিউ রয়েছে। এটার দৃশ্যায়ন রয়েছে অর্থাৎ এর দর্শন রয়েছে।

এই দর্শনকৃত ঈমান বা হালের যে অবস্থা, সেই অবস্থাটা হলো পরিপূর্ণতার একটি হাল অর্থাৎ সত্যের জগৎ। এজন্য আমার মোর্শেদ কেবলা বলে থাকেন যে, পীর বাবা বড় না বড় হলো সত্য। তাহলে তুমি সত্য লাভ কর। আমার কাছে এসে তুমি যদি সত্য লাভ করতে না পার তাহলে তুমি অন্য পীরের স্মরণাপন্ন হও। সেখানে গিয়ে হলেও তুমি সত্য লাভ কর। অর্থাৎ সত্যটা বড়।

চূড়ান্ত পর্যায়ের মধ্যে যে লা ধারি স্তর, সেই স্তরে যখন ওলিরা পৌঁছে যায়, সেখানে আর দ্বিতীয় কোন বিভাজন থাকে না। এই দ্বিতীয় বিভাজন না থাকলেই সেটাই পরিপূর্ণ স্তর। সেখানে আর পীর থাকে না। তখন যিনি এটাকে ধারণ করে, তিঁনিই তাঁর পীর, তিঁনিই তাঁর মোর্শেদ। অর্থাৎ তিঁনিই একাকার তিঁনিই আল্লাহ্ রুপে ঘোষণা দেন, এই স্তরেই হয়ত ওলি

মাশায়েখগণ তাদের ঐ সমস্ত ধারাবাহিক প্রণালির বর্ণনাগুলো দিয়ে থাকেন। এজন্য মূলধারায় যেতে হলে আপনারা সবাই চেষ্টা করবেন যে:-

১) **একজন ওলি বা মোর্শেদের কাছেব বায়াত বা মুরিদ হওয়া।**
২) **তাঁর দেওয়া মোরাকাবা মোশাহেদা অনুযায়ী নিজেকে স্থায়ী করা, এ বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা বা চৈনত্য লাভ করা।**
৩) **পরিপূর্ণতার দিকে ধাবিত হওয়া।**

এই তিনটি বিষয়কে কার্যকারিতা করতে হবে। তবেই ধর্ম সম্পর্কে পরিজ্ঞাত হতে পারবেন। তা না হলে হয়ত আমি আজকে যেটা বর্ণনা করছি, অপরজন এটার সুন্দর সুন্দর যুক্তি বা কথা উপস্থাপন করলে এটা তখন ডাইভার্ড হয়ে যাবে আপনার কাছে। কারণ আপনি যুক্তি বা সুন্দর কথার মূর্ছণায় পরে আপনি যে সত্যকেই ফেলে দিলেন, এটা আর বুঝতে পারবেন না। এই আলোচনার প্রেক্ষিতে কেউ সত্যকে গ্রহন করবে বা পজিটিভ কাজ করবে, কারো আবার নেগিটিভ কাজ করবে। জ্ঞান নেগিটিভ-পজিটিভ দুই ধারাতে কাজ করে। মাছিরা খোঁজে কোথায় ক্ষত রয়েছে আর মৌমাছিরা খোঁজে কোথায় মধু আছে। দুইটি শ্রেণী:- এক শ্রেণী দোষ খোঁজে অপর শ্রেণী ভাল কিছু সংগ্রহ করে। তেমনি আমাদের সমাজে কিছু লোক আছে যারা অন্যের ভিতরে ভালগুণ গুলো দর্শন করে আর কিছু লোক আছে যারা অপরের নিন্দা করতে ভালোবাসে। সত্যের দর্শন থাকলে আমরা কারো সম্পর্কে উল্টাপাল্টা কথা বলতাম না। তাই সত্যকে লাভ করতে হবে। মহানবী (সঃ) বিশ্ব শান্তি, শ্রী কৃষ্ণ জীবে প্রেম, যীশু বিনয় এবং নম্রতা, তথাগত বুদ্ধ অহিংসার বাণী প্রচার করে গেছেন, কিন্তু তুমি মানুষ হয়ে যদি কেবল অশান্তিই প্রচার করো, তাহলে তোমার ধর্ম রইল কই!

এজন্য আমি বলে থাকি আমার পীর ও মোর্শেদ কেবলার আহ্বান করেছেন যে, অনেক কষ্ট করে তিল তিল করে নরসিংদী জেলার শিবপুর থানার জয়নগর ইউনিয়নের নৌকাঘাটা গ্রামে একটি ধ্যান সাধনার স্কুল করা হয়েছে। যদি কারো মনে চায়, অন্য পীরের মুরিদ হলেও আপত্তি নেই। স্কুলটায় গিয়ে সে মোরাকাবা মোশাহেদার মাধ্যমে এই আমল নীতিতে স্টাডি করে বা প্রাকটিক্যাল করে সে সত্য জানতে চেষ্টা করতে পারেন।

তিনি আরও বলেছেন যে, আসো বসো মুরিদ হও, আমার কথা মত চারটি মাসের একটি মোরাকাবা কর, আইনুল একিন যদি কিছু দেখতে না পাও আধ্যাত্মিকতার রাজ্যে, তাহলে সে দরজায় দাঁড়িয়ে আমাকে গালি দিও যে বাবা আমি কিছু পায় নি। আমি মাথা নিচু করে থাকব। তাহলে এই মোরাকাবা মোশাহেদায় কিছু না কিছু আইনুল একিনের উন্মেষ হয়, জাগরণ হয়।

তাহলে সেই স্টাডি গুলো আমরা যেন করতে পারি সেই প্রক্রিয়ার জন্য সবাই প্রস্তুত হবেন। তাই আপনাদের বার বার অনুরোধ করি। মোরাকাবা মোশাহেদার জন্য আপনাদেরকে প্রস্তুত হতে হবে। আপনাদের সকল প্রতিকূলতার বন্ধনকে ছিন্ন করে হলেও এই চার মাসের একটি করে মোরাকাবা করতে হবে। তা না হলে আপনাদের এই মুরিদ হবার স্বার্থকতা থাকবে না।

তাই আমার পক্ষ থেকে আপনাদের জন্য নির্দেশনামা হলো, এই চার মাসের অন্তত একটা মোরাকাবার একিন রাখেন। এর জন্য প্রচেষ্টা করেন এক সময় হয়ত মালিক আপনাকে এই প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করবার জন্য সহায় হবেন।

হায়াতে ডাঃ বাবা জাহাঙ্গীর বা-ঈমান আল-সুরেশ্বরী

অদ্য ১লা রমজানুল মোবারক ২০২০ ইং তারিখে বাবা পর্দা গ্রহন করেন। অতিব দুঃখের সাথে জানাইতেছি যে, এই খবর জাগতিক বাস্তবে শোনার পর হইতে দেহে প্রাণ আর সক্রিয় ভাবে কাজ করছে না। কিন্তু চলমান দুনিয়া তো আর আমার জন্য থেমে থাকবে না। বার বার পজিটিভ হতে চেষ্টা করি। কোথা হতে যেন অদৃশ্যের ভাবনা ঢেউ এর মত এসে সব হারিয়ে দেয়। এভাবে ক্ষন অতিবাহিত হওয়ায় শরীরটা একটু দূর্বল ও নিস্তেজ হয়ে আসছে। ধীরে ধীরে হৃদয়ে কালো মেঘের আঁধার নেমে আসতে শুরু করেছে।

বাবার নিকট মুরিদ বা বায়াত হবার পর থেকে বাবার বিদায় পর্যন্ত যে সকল স্মৃতি গুলো আমার হৃদয়ে সঞ্চিত হয়ে আছে, সেগুলো বার বার উকি দিয়ে যায়। তাঁর বাণী, আচার-আচরণ, ভাল লাগা-মন্দ লাগা এ সবকিছুর আলোকে মনে হয় এক ব্যতিক্রমধর্মী মানব রুপেই নিজেকে মেলে ধরে ছিলেন।

এমন মানব আর হয় না হতে পারে না। আমার খুব একটা বেশি সময় তাঁর নিকটে অবস্থান করার সুযোগ হয় নাই। যতটুকু হয়েছে, তাতে আমার নির্ণয়কৃত জ্ঞান দ্বারা এমন ধৈর্য্য ধারণ করা মানব খুব কমই আছেন। তাঁর সবচেয়ে যে ভাল গুনটা দেখতাম সেটা হলো, তিঁনি নিজের দুঃখ বা ব্যথাটা কারো সাথে বিনিময় করতেন না। আনন্দময় বিষয় গুলো বা আনন্দের মুহূর্তগুলো শিশুর মত আলাপ চারিতা করতেন।

প্রথম যখন বাবার দরবারে যাই তখন মনে পড়ল (ইমাম জাফর সাদিকের পীর) ইমাম আবু হানিফার কথা :-

“ওলির দরবারে যাও
ওলির দরবারে গেলে তকদির পরিবর্তন হয়
কারণ ওলিরা খোদার জাত”

সভ্যতার আলোকে ধর্ম সম্পর্কেই আমার ধারণা। আধ্যাত্মিকতার মূল বিধান সম্পর্কে আমার কোন ধারণাই নাই। এমন অবস্থা নিয়ে তাঁর দরবারে বা নিকটে উপস্থিত হলাম। বাবা বললেন, সাধনা করার ইচ্ছা থাকলে মুরিদ হও আর ইচ্ছা না থাকলে অনেক দূর থেকে এসেছো খাওয়া দাওয়া করে বিদায়

হও। এমন কথাতে যেন মহা সমুদ্রে নিপতিত হতে লাগলাম। একে তো ধর্মের লেবাস নেই তার উপর আবার এমন নির্দেশনামা। তবে মোরাকাবা মোশাহেদা করলে এখানে সত্য আছে কি না তুমি সেটা জানতে পারবে, সত্য না পেলে চলে যেও। তাই সে দিন তাঁর কথাতে নিরীক্ষা করতে মুরিদ হই। এখান থেকেই সুফিবাদে পথ চলা উনি চালিয়ে নিচ্ছেন।

হতাশাটা যেন কোন ভাবেই দূর করতে পারছি না, এ কারণে কলম ধরেছি। বীণা অনুমতিতে বাবার রুমে কখনই প্রবেশ করতাম না। একদা বাবা বললেন, বাবা তোমার জন্য কোন অনুমতির প্রয়োজন নেই। তোমার যখন খুশি ইচ্ছা তখনই চলে আসবে, এমন কি যদি তোমার মায়ের সঙ্গেও থাকি তবুও তোমার অনুমতি লাগবে না। মাঝে মাঝে মনে হয় এমন সনদ পৃথিবীর কোন আপনজন দিতে পারে! তবুও তাঁকে চিনতে পারিনি। নিয়তির অমোঘ কালো অন্ধাকার করে বিষাদময় একটি অবস্থা করে দিল। যদিও নফ্স ধারী আত্মাকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহন করতেই হবে। বুঝবার মত সময় দেননি।

কারণ রমজানুল মোবারক আগত তিন দিন বাকী এমন রাতে বাবা এলেন, আমি তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হঠাৎ বাবার কথাতে চিৎকার দিয়ে উঠি। ঘুমের অবসান হলো। ঘরে বাইরে উকি দিয়ে দেখি কোথাও কেউ নেই, আমার বুঝতে আর বাকী রইল না। চারিদিকে লকডাউন চলছে... ২১ শে এপ্রিল ২০২০ ইং। সেই রাত থেকেই একটি অজানা কষ্ট বুকের মধ্যে চেপে চলতে লাগলাম। এর পূর্বেই দরবারে যাতায়াত নিরুৎসাহিত করেছেন। এভাবেই সময় ফুরিয়ে গেল বাবার সান্নিধ্যে পৌঁছানো হলো না, তিঁনি পর্দা গ্রহন করে নিলেন।

অস্বস্থির একটি নিঃশ্বাস হৃদয় আসনে স্থায়ী করে নিল। এই স্মৃতিচারণ হয়ত কোন দিন কোন কালেই ভূলতে পারবোনা। একটু ইশারা রাখতে পাঠকের জন্য তুলে ধরলাম। বাবার মুখে যে কথাটা বার বার শুনতাম তা হলো:-

“বিনয় এবং নম্রতা যার মধ্যে নাই
তার জন্য সুফিবাদ হারাম”

সুরেশ্বর দরবার শরীফ মোবারকে বাবাকে বিনয়ের সম্রাট খেতাবে ডাকতেন। বাবার সঙ্গে সুরেশ্বর দরবার শরীফে গমন করলাম। একা একা বাবা চলতে পারে না, চারজন মিলে ধরে নিতে হয়। অনেক কষ্ট করে পৌঁছালাম শাহ্ সুফি

বাবা আলম নূরী আল-সুরেশ্বরীর মহলে। সেখানে বাবার বিশ্রামের জন্য দুইটা রুম দিয়েছিলেন। সেখানে বাবা, আওলাদগণ সহ প্রায় তিনশত'র মত ভক্তকূল।

শরীরে কুলায় না তবুও যেন হার না মানা এক সৈনিকের মত বাবা রুমে অবস্থান না নিয়ে, প্রতিটি আওলাদে সুরেশ্বরীর আস্তানায় গমন করলেন তাঁদের প্রতি তাজিম করতে। বাবার তাজিম (আদব, বিনয়, নম্রতা) ভাষায় উল্লেখ করা দায়। বাবা বেদম ওয়ারেছী আমাকে বললেন, ভাই তুমি বাবার রুমের সামনে থেকে বাবার বিশ্রামের ব্যবস্থা হলে কেউ যেন বিরক্ত না করে।

শীতের রাত, মাঘ মাসের বড় ওরশ। ঘরের সিঁড়ীতে বসে আছি রাত্রি ২টা বাজে (আনুমানিক)। কখন যে ঘুমিয়ে গেছি নিজেও জানি না। রুম থেকে বাবা বের হয়ে বাথরুম সেরে আবার রুমে ঢুকতেই ডাক দিলেন' দেলোয়ার! আমি জেগে দেখি হায়রে আমার দায়িত্ব পালন। বাবা বললেন, শরীর খারাপ লাগলে বিশ্রাম নাও। এমন করে বলা হয়ত আর কেউ বলবে না। এরকম অজস্র স্মৃতি বার বার স্মরণ করে দেয় যা কখনই ভূলা সম্ভব নয়।

বাবার সহবত যারা পেয়েছেন, তারা বাবার আধ্যাত্মিক মোজেজা পেয়েছেন। বাবা সুফিবাদের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র এবং কারিগর। কিভাবে একজন সাধারণ মানুষকে সুফিতে রুপান্তর করতে হয় এটাই তাঁর কারিশমা। শাসন দিয়ে নয়, প্রেম দিয়ে বাবা এটা করতেন। তাঁর একটি বাণীতে লিখেছেন:-

"শক্তির পূজারী দুনিয়াতে কিছু পেতে চায়
প্রেমের পূজারী সেচ্ছায় সবকিছু হারাতে চায়"

উনার দৃষ্টান্ত ভাষার শৈলীতে উপস্থাপন করা আমার মত গন্ড-মূর্খ অজ্ঞানীর পক্ষে তুলে ধরা বেমানান। তাই উচ্চ শিক্ষিত সুফিবাদের উঁচু সিঁড়ীতে যারা উচ্চে অবস্থান করছেন, আপনারা উপস্থাপন করলে মনে হয় একদিন জাতির জন্য তা উপস্থাপিত হবে। এখানে আবেগ বসত একটু স্মৃতিচারণ করে রাখলাম মাত্র। মওলা সহায় হউন, সকল সুফি ও আশেকদের প্রতি। সকলের কল্যাণ হোক। আমিন।

ডাঃ বাবা জাহাঙ্গীর বা-ঈমাম আল-সুরেশ্বরীর মূল্যবান কিছু

বাণী চিরন্তনী

❋ "অগণিত, অসংখ্য গুণ গুলোকে একত্র করে নাম দেওয়া হয়েছে আল্লাহ্। আসলে আল্লাহ্ বলতে কিছুই নাই বলা যাবে না। কারণ আল্লাহ্ দর্শনের বহু উর্ধ্বের একটি নাম। এই দর্শনটির নামই হলো ফিলোসোফি ইউনিফরচুনেটি অব নেচার তথা প্রাকৃতিক ঐক্যতানের দর্শন"

❋ "একটি মাত্র চিরন্তন ধর্মের মধ্যে সাধকেরা অবস্থান করেন। ইহাই পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের ধর্ম, ইহাই রিলিজিয়ন অব ডেডিকেশন, ইহাই হলো নমস্তে, হরিওঁম, ইহাই আরবি ভাষায় ইসলাম"

❋ "কামেল পীরেরা অনেক ধ্যান সাধনা করবার পর আল্লাহ্পাকের বিশেষ রহমত অর্জন করতে পেরেছেন। সেই রহমতটি আর কিছুই নয়, কেবল খান্নাসরুপী শয়তানটিকে তাড়িয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে রুহ তথা আল্লাহ্ স্বয়ং রবরুপে আত্মপ্রকাশ করেন। তখন নফ্সটি হয়ে যায় রুহ এর বাহন মাত্র"

❋ "সত্য সাগরে অবগাহন করার বাসনাটি যাদের প্রবল তাদেরকেই কেবল বলছি গুরু না ধরে ভূলেও সাধনা করতে যাবেন না। কারণ তখন কপালে জুটবে কাঁচকলা। আপন সত্ত্বার সঙ্গে খান্নাসটি অবস্থান করার দরুন গুরুর কাছে আত্মসমর্পণ করতে চায় না। ইহাই খান্নাসের কুমন্ত্রণা"

❋ "মানুষ নিজের ভেতর ঘুমিয়ে থাকা সত্যটিকে বুঝতে না পেরে উর্ধ্ব গগণে আল্লাহ্র অবস্থানটি আছে বলে বিশ্বাস স্থাপন করে আকাশের দিকে তাকিয়ে প্রার্থণার ভাষাটি বলতে থাকে"

❋ "রুহের পরিপূর্ণ দর্শনটিকে আমরা তথা মুসলমানেরা নূরে মোহাম্মদীর দর্শন বলে থাকি। আবার অন্য যে কোন ধর্মের যে কোন সাধক যদি রুহের পরিপূর্ণ দর্শনটি লাভ করে থাকেন আর যদি সেই ধর্মের প্রবর্তকের নামে নূরটির নামকরণ করে থাকেন তাহলে আমার বলার কিছুই থাকে না। কারণ আল্লাহ্ এক তাঁর নূরও এক এবং বীজরুপী রুহের অবস্থানটিও এক"

❋ "আসলে উলঙ্গ সত্য কথাটি বলতে গেলে বলতে হয় যে, রুহুল আমিন হলো মহানবীর আপন আধ্যাত্মিক প্রতিচ্ছবি ইহা জগতময় ব্যক্তও হতে পারে আবার যে কোন রুপ মুর্তি ধারণ করতেও পারে। ইহা স্থান-কালের (টাইম এন্ড স্পেস) সব রকম মানুষের আদি এবং আসল রুপ। এই রুপের মাঝে প্রত্যাবর্তন করাই মানব জীবনের পরম এবং চরম স্বার্থকতা। আল্লাহ্র নিকট মানুষের প্রত্যাবর্তন করা তথা ফিরে আসার অর্থটি ইহাই"

❋ "আল্লাহ্র প্রত্যেক ওলি. যাদের আমরা মহা মানব বলে থাকি তাঁরা রুহুল্লাহ্ তথা আল্লাহ্র রুহ"

❋ "ধর্মীয় অনুশাসনে প্রত্যেকটি বিষয়ের দুইটি দিক থাকে, একটি বাহির অপরটি ভিতর"

❋ "বৈষয়িক চিন্তা চেতনার মধ্যে যখন একজন মানুষ প্রচন্ড ভাবে ডুবে থাকে তখন আধ্যাত্মিক জ্ঞান এবং সত্যের পরিচয় জানবার ধ্যান সাধনা তথা মোরাকাবা মোশাহেদাটি করতে পারে না"

❋ "একই তুচ্ছ বিষয়ের বর্ণনায় কেউ হেদায়েত গ্রহন করেন আবার কেউ হেদায়েতের বলয় থেকে ছিটকিয়ে দূরে পড়ে যান"

❋ "ফেরেশতারা যতই শক্তিশালী হোক না কেন, তারা মানুষের চেয়ে জ্ঞানী নয়"

❋ "দুনিয়ার লোভ ও মোহের সুতাগুলো এতই শক্ত যে মুক্তির দর্শনের আহ্বানটি কানে ও হৃদয়ে প্রবেশ এবং আঘাত করতে পারে না। ইহা তাদের তকদির কি না জানি না, তবে আল্লাহ্ কর্তৃক যে সীমিত স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি দেওয়া হয়েছে সেই স্বাধীনতার বলয় হতে স্বেচ্ছায় মুক্তির দর্শনটিকে তারা আলিঙ্গন করতে চায় না"

❋ "আপন নফ্সের সঙ্গে মিশে থাকা খান্নাস হতে মুক্ত নেওয়াই ধর্মের একমাত্র উপদেশ"

❋ "যারা আল্লাহ্র সঙ্গে যোগাযোগটি স্থায়ী করার ইচ্ছায় ধ্যান সাধনায় মশগুল থাকেন, তাদেরকে সালাতি তথা (দায়েমি) নামাজি বলা হয়। সালাতি শব্দটির বাংলা অর্থটি হলো যোগী"

❋ "ঘর ছেড়ে দিলেই সংসার বৈরাগী হয় না, বরং খান্নাসরুপী শয়তানকে নিজের পবিত্র নফ্স থেকে তাড়িয়ে দিতে পারলেই হয় বৈরাগ্য। এই বৈরাগ্য সাধনই ইসলামের মূল মন্ত্র"

❋ "যে কল্যাণের সাহায্যে মানুষ মৃত্যুকে জয় করে নিতে পারে তথা জ্ঞান চক্রের ঘূর্ণায়মান বৃত্ত হতে নিজেকে মুক্ত করতে পারে উহাই আল্লাহ্র দৃষ্টিতে একমাত্র কল্যাণ তথা একমাত্র রহমত। ইহাই আল্লাহ্কে পাবার পথে ধাবিত করে এবং পরিশেষে যাহা পাওয়া উচিৎ সেই রবরুপী আল্লাহ্র সঙ্গে মিলনে একাকার হয়ে যায়"

❋ "লোভ, মোহ, ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ ইত্যাদি কুলষিত কালিমার তিনশ ষাটটি (হিজরি সনের মাপকাঠিতে) মুর্তি মানব দেহে বিরাজ করে। এই মুর্তিগুলোকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখবার নামই হজ্ব। তওয়াফের মাধ্যমে বার বার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দর্শনের দ্বারা পরিশুদ্ধ হতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে"

- “পিতৃ পুরুষের অনুসরণ এবং অনুকরণ করবার অভ্যাস ধর্মজীবনে সত্য লাভের পথে সত্যিই একাটি শক্তিশালী বাঁধা”

- “ছয় রিপুর মাধ্যমে যাহা মনমগজে বাসা বাঁধতে থাকে উহাই একটি একটি করে হিসাব করে বর্জন করে দেবার সাধনাটির নাম সিয়াম”

- “লোভ, মোহ, মাৎসর্য্য, কাম, ক্রোধ, অহংকার এগুলো মিলিত ফসলের নামই হলো শয়তানি”

- “ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান বলার চেয়ে কি- ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শন বললে আরও বেশি ভাল মানায় না ?”

- “মমিন তিঁনিই, যিনি এই কামনার বন্ধন হতে মুক্ত হতে পেরেছেন। এই কামনাই দুনিয়ার কর্মগুলোকে কুলষিত করে ফেলে”

- “মানুষকে জন্মলগ্ন হতে ফেরেশতা এবং জ্বীন উভয়ের স্বভাবের সমন্বয়েই সৃষ্টি করা হয়েছে”

- “আল্লাহ্ হতেই আমাদের আগমন আবার আল্লাহ্র দিকেই আমাদের প্রত্যাবর্তন। এই প্রত্যাবর্তনের সময়ে অতিরিক্ত কোন ভেঁজাল নিয়ে যাওয়া যাবে না। শোধন কর্মের মাধ্যমে এই অতিরিক্ত বিষয় সমূহকে পরিত্যাগ করে পূর্বের মত যখন হতে পারবে তখনই আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন করা যায়। সেই অতিরিক্ত বিষয়টির নামই হলো আমিত্ব তথা খান্নাসরুপী শয়তান”

- “পৃথিবীর এক মিনিটের মধ্যে যতগুলো ঘটনা ঘটে চলেছে এক একটি বিশেষ রুপ বৈচিত্রে সেই এক মিনিটের অগণিত রুপগুলো আর কোন দিনও দেখানো হয় না এবং হবেও না। এই কারণে মহান আল্লাহ্পাক জিল জালাল এবং কারামতওআলা”

- “সাধক যখন ধ্যান সাধনার মাধ্যমে বীজরুপী রুহ্‌কে পূর্ণাঙ্গ রুপে প্রকাশ করার সাধনায় মত্ত থাকে এবং আল্লাহ্‌র বিশেষ রহমত প্রাপ্ত হলে রুহ্‌ আলোর মুর্তি ধারণ করে এবং এই আলোকিত নূরটির আত্মপ্রকাশ নিজের ভিতর থেকেই ফুঁটে এবং ইহাকে হুর বলা হয়। হুরের রুপটি মানুষের নিজের নূরানী অতীব সুক্ষ্ম চেহারা ছাড়া আর কিছুই নয় এবং এটাই হলো আত্ম দর্শনের চরম পর্যায়”

- “আল্লাহ্‌কে আপন নফ্‌সের উপর পূর্ণরুপে জাগ্রত করে তোলার ধ্যান সাধনার নামটিই সুফিবাদ”

চূড়ান্ত স্থায়ীত্ত্বের ভাবধারা নিয়ে আলোচনা

বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম।
অর্থঃ- আল্লাহ্‌র নামে শুরু আর-রহ্‌মান (যিনি দয়াল দাতা)
এবং আর-রহিম (যিনি দয়ালু)।

→ **কূল্লুমান আলাইহা ফান।**
অর্থঃ- সকল কিছুই ধ্বংসশীল।

→ **ওয়া ইয়াবকা ওয়াযুহু রব্বুকা,**
জুল জালালি ওয়াল ইকরাম।
অর্থঃ- শুধু থাকবে তোমার রবের চেহারা,
জামালিয়াত এবং কামালিয়াতের দুইটি রুপ।

(সূরা আর-রহ্‌মান, আয়াত নাম্বার :- ২৬ এবং ২৭)

প্রথমেই বলা হলো যে, সকল কিছুই ধ্বংসশীল অর্থাৎ ধ্বংস হয়ে যাবে। যা ধ্বংস হয়ে যাবে তা স্থায়ী নয় অর্থাৎ অস্থায়ী। যেমন আমরা দুনিয়াতে এসেছি এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এখান থেকে ফিরে যেতে হবে। তাই এই সময়টা হলো অস্থায়ী, মানে এটার স্থায়ীত্ত্ব নেই। কেউ ইচ্ছা করলে এখানে থাকতে পারবে না। সময় হলে যেতে হবে, যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

তাই আল্লাহ্‌র এই কারিগরি সিস্টেম মাফিক আমাদের দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে। সেই কারিগরি পদ্ধতিগত ভাবে যে ব্যবস্থায়ন জারী হয়েছে সেই ব্যবস্থাটুকু হলো এমন যে, এখানে কেউ স্থায়ীত্ত্ব পাবে না। কিন্তু এখান থেকে সেই স্থায়ীত্ত্বের রোজগার, উপার্জন বা কামাইটুকু যদি কেউ করতে পারে, তাহলেই তার নিশানাটুকু স্থায়ী রুপে চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এজন্য কালামপাকে বর্ণনা করা হয়েছেঃ- কূল্লুমান আলাইহা ফান। অর্থঃ- সকল কিছুই ধ্বংসশীল। অর্থাৎ সৃষ্টিরাজ্যে যা কিছু রয়েছে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে।

এ বিষয়ে যদি আমরা একটু বুঝতে চাই তাহলে এমন যেঃ- দুনিয়ার জিন্দিগিতে আমরা এই ধর্মীয় পালনতব্য বিষয়ের মধ্যে নিজেকে নিহিত করবার পর সবচেয়ে বড় আশা আকাংখা থাকে হলো জান্নাত বা বেহেস্ত লাভের।

জাগতিক ভাবে এটা প্রায় সবার মনে একটা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে রুপ নিয়েছে। সবাই জান্নাতের আশা বা বেহেস্তের লোভের ইবাদত বন্দেগিতে মশগুল থাকে, এটাই তাদের উচ্ছ্বাস বা চাওয়া। এই জান্নাতের মোহে পরে যাই কিছু করি কিন্তু এখানে যে জান্নাত চিরস্থায়ীভাবে থাকবে, এটা কিন্তু এই আয়াতে কারিমায় নেই।

দুইটি রুপ থাকবে, তাছাড়া সকল কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। যদিও জাগতিক ভাবে যারা আলেম বা ধর্মীয় পন্ডিত তারা সমাজে ধর্মের শিক্ষাগুলো দিয়ে থাকেন, তারা বলে থাকেন যে পরকালে অনন্তকালের সুখের নিবাস বা জান্নাত ভোগের ব্যবস্থা রয়েছ। কিন্তু এই আয়াতে কারিমায় জান্নাত যে স্থায়ীত্ব পাবে বা চিরস্থায়ী ব্যবস্থার মধ্যে জান্নাত থাকবে, সেটা কিন্তু উল্লেখ নেই। বলা রয়েছে সকল কিছু ধ্বংসশীল বা ধ্বংস হয়ে যাবে। এক কথাতেই সব শেষ। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্পাক বলেছেন:- কুল্লু নাফ্সিন জায়িকাতাল মাউত। অর্থ প্রত্যেক নফ্স মৃত্যুর স্বাদ গ্রহন করবে। এই আয়াতে কারিমায় শুধু মানুষের মৃত্যু হবে এমনটা বলা হয় নি। অর্থাৎ সৃষ্টিরাজ্যে যা কিছু নফ্সধারী রয়েছে, সবারই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহন করতে হবে, এই কথাতেই সম্পূর্ণ করে দিয়েছেন। ঠিক এমন ভাবে এই আয়াতে কারিমায় বলা হলো যে:- কূল্লুমান আলাইহা ফান। অর্থ:- সকল কিছুই ধ্বংসশীল। তাহলে সকল কিছু ধ্বংস হলে জান্নাত ধ্বংসশীলের মধ্যে আসতে পারে। আবার পরকালে যে জাহান্নামের ভয় করি সেটা যে স্থায়ী থাকবে এটার কিন্তু উল্লেখ্য নেই। এই আয়াতে কারিমার থিসিস বা গবেষণার প্রেক্ষিতে এই কথা বললাম।

অবশ্য ওলি বা সুফিদের মতাদর্শের পথে আসার আগে, আমরা আলেমদের কাছে শুনতাম বা জানতাম তারা বলতেন যে, জান্নাতের শান্তি বা জাহান্নামের কষ্টের শেষ নেই, এটা কি চিরস্থায়ী ভাবে থাকবে। অনন্তকাল এই কষ্ট ভোগ করবার পরে মালিকের দয়া হলে তাকে জাহান্নাম থেকে জান্নাতে স্থানান্তর করে দিবে। এটা হলো শোনা কথা। জান্নাত এবং জাহান্নাম উভয়ই ভোগ। জান্নাত হলো:- সুখ, শান্তি, বিলাস ভোগ। আর জাহান্নাম হলো:- দুঃখ-কষ্ট, জালা-যন্ত্রণা ভোগ। তাহলে উভয়ই ভোগ।

আমরা যদি প্রথম মানব-মানবী বাবা আদম (আঃ) এবং মা হাওয়া (আঃ) এর দিকে তাকায়, তাহলে দেখা যায় যে, তাদেরকে সৃষ্টি করে জান্নাতে রাখা

হয়েছিল। একটি আদেশ অমান্য করার ফলে জান্নাত থেকে বের করে দেওয়া হয়। তাহলে অনন্তকাল বা স্থায়ীত্ত্বের যে স্বপ্ন আমরা দেখি, তাঁদের দিকে দৃষ্টিপাত করলে এটার বিষয়টা ভিন্ন হয়ে যায়। তাহলে মূল বিষয়টা আয়াতে কারিমায় বলা হয়েছে:- সকল কিছুই ধ্বংসশীল।

তাহলে থাকবে কী ? ওয়া ইয়াবকা ওয়াযুহু রব্বুকা, জুল জালালি ওয়াল ইকরাম। অর্থ:- শুধু থাকবে তোমার রবের চেহারা, জামালিয়াত এবং কামালিয়াতের দুইটি রুপ। তাই সৃষ্টিরাজ্যে অনুশীলনগামী যে ব্যবস্থা, বিশেষত্ব ওলি বা পীর মাশায়েখদের প্রদত্ত বিধানের আলোকে বর্তমান জামানাতে এই রাস্তা বা পথ। যে অনুশীলনগামী ব্যবস্থায় মোরাকাবা মোশাহেদার মাধ্যমে একটি মানব তার আপন পীর বা মোর্শেদের রুপের যে একটি সাধন ও ভজনে লিপ্ত থাকে, সেই সাধন এবং ভজনের রুপ থেকে রুপান্তরবাদ বা পরিবর্তিত ধারাতে মওলার রুপের একটি ধারাবাহিক অবয়ব সে পেয়ে যায়। আর সেই ধারাবাহিক প্রণালীতে এই রুপেরই সাধন এবং এই রুপেরই ভজন করা হয়। এই রুপকে আয়ত্ত্বে নেওয়ার জন্য মোডিফাইকৃত কথা গুলো, আমরা জড়িয়ে পেঁচিয়ে বলে থাকি। কারণ জাগতিক যে বিধানাবলি রয়েছে সেটার মান সৌন্দর্য্যময় রাখতেই এরকম কৌশল অবলম্বন করতে হয়। এই কৌশল অবলম্বনের মাধ্যম দিয়ে আমাদেরকে এগুলো প্রকাশ করতে হয়। সরাসরি বললে আর কিছু থাকে না। কারণ কোরান বলছে তোমার রবের চেহারাই স্থায়ীত্ত্ব পাবে। তাহলে রবের চেহারা! রবকে পেলে তো তাঁর চেহারাকে ধারণ করা যায়।

সৃষ্টিরাজ্যে তাঁর যত মসজিদ (ইবাদত খানা) ঘর বা আসন রয়েছে এটা মানুষ কর্তৃক নির্মিত। আমরা সাধারণত জাগতিক ভাবে এই নির্মিত মসজিদকে আল্লাহ্‌র ঘর বলে জেনে থাকি। তাহলে মসজিদে গিয়ে সেখানে আল্লাহ্‌কে পেলে আমরা সবাই তারঁ রুপকে ধারণ করে নিজের মধ্যে রাখতে পারি। কিন্তু সেখানে তো আল্লাহ্‌র কোন দিশা বা অবয়ব মিলে না। আসলে আমরা মসজিদ কেন্দ্রিক ব্যবস্থায় যে লিপ্ত হই, সেই পরিগনিত ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকে হলো স্রষ্টার সন্তুষ্টির জন্য কিছু ইবাদত বন্দেগী করা।

স্রষ্টার তালাশকৃত যে কার্যক্রম, সেটা মসজিদ কেন্দ্রিক ব্যবস্থায় নেই। এটা হলো ইবাদত খানার ঘর। মসজিদ যদি আল্লাহ্‌র ঘর হয়! তাহলে যাদের

অর্থবিত্ত বা প্রচুর ধন-সম্পদ রয়েছে, তারা ইচ্ছা করলে তার জিন্দিগিতে একখানা বা দুইখানা বা কেউ ইচ্ছা করলে একশখানা আল্লাহ্‌র ঘর বানিয়ে দিতে পারে। তাহলে এটা আল্লাহ্‌র ঘর নয়, এটা হলো রুপক ব্যবস্থা। কারণ এই রুপকতা দিয়ে আসলকে খুঁজে বের করবার জন্য কিছু চিহ্ন বা কিছু নিদর্শন ব্যবস্থা জারী করে রাখা হয়েছে। কারণ এই আনুষ্ঠানিকতা বা রুপকতার ব্যবস্থায় যখন একটি মানুষ এখানে (মসজিদে) আসে, আসবার পর তার এই চিন্তা চেতনার বিকাশ হবে। তকদিরে থাকলে সে তখন মূলকে খুঁজতে অনুশীলনগামী ব্যবস্থার দিকে ধাবিত হবে। আর এই আনুষ্ঠানিকতা বা রুপকতা যদি না থাকে, তাহলে সে কী করে মওলার কারিকুলাম সম্পর্কে অবগত হবে ? এটা সে যদি জিন্দিগিতে না শুনে বা না দেখে থাকে ? আল্লাহ্‌পাক কালামপাকে বলেছেনঃ- কুলুবিন মুমিনিন আরশে আল্লাহ্‌। অর্থঃ- মমিনের কলবই হলো আমার (আল্লাহ্‌র) বসিবার স্থান। আর রাসুল (সঃ) বলেছেনঃ- কুলুবিন ইনসানি বাইতুর রাহ্‌মান অর্থাৎ (প্রকৃত) মানুষের অন্তর হচ্ছে আল্লাহ্‌র ঘর। সুফি কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেনঃ- মসজিদ এই, মন্দির এই, গীর্জা এই হৃদয়, এখানেই বসে ঈসা, মুসা পেল সত্যের পরিচয়। তাই রুপক ভেঙ্গে আবার তৈরী করতে দেখা যায়, স্রষ্টার প্রেমিকের অন্তর ব্যতিত স্থায়ী কোন মসজিদ নেই।

বিষয়টা এমন আমরা সুফিরা যে সকল আলাপ আলোচনা করে থাকি, সাধারণ জনতার মুখে এটা ভিন্ন রকম বাণী হিসাবে দাঁড়িয়ে যায়। এরকম কথা তারা কখনই শুনে নাই বা এরকম আলোচনা তাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। অনেকেই এভাবে প্রকাশ করে ফেলে। এর অর্থ কী ? এর অর্থ হলো এই রুপকতার ঢাকনার আবরণে আমরা নিজেদেরকে এমন ভাবে ঢেকে ফেলেছি, যার কারণে মূলকে উদ্ধারের ব্যবস্থার দিকে মানুষ আর পরিগমন করতে চাচ্ছে না। রুপকতা হলো সহজ সরল ব্যবস্থা যা সবাই মেনে নেয় বা করতে পারে।

কিন্তু বিশেষ ব্যবস্থা বেশির ভাগ মানুষই মানতে পারে না। প্রতিকূলতার বন্ধন, জ্ঞানসীমা এবং এভাবে পরিশ্রমী মানসিকতারও প্রয়োজন থাকে। যদি এগুলো প্রতিযোগিতা মূলক হত, তাহলে সবাই পরস্পরের মধ্যে একটা রেওয়াজ বা রীতি কার্যকরি প্রথা চালু থাকত। যেটা প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে নেই, সেটা বিশেষ কিছু লোকজন করে যাচ্ছেন। যার কারণে এটা একটি ভিন্নতার মানদন্ড। তাহলে মসজিদকে আমরা আল্লাহ্‌র ঘর বলে থাকি এটার রুপ রেখাটাও এমন।

মসজিদে গেলে যদি আল্লাহ্‌কে পাওয়া যেত, তাহলে আমরা সবাই মসজিদগামী ব্যবস্থার দিকে যেতাম। এই সমস্ত ওলি মোর্শেদ পদত্ত পথে আমরা কেউ পা বাড়াতাম না। এখন দুনিয়াতে যত মসজিদ আছে সকল মসজিদ ঘর কাবাকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয়েছে। আল্লাহ্‌র ঘর মক্কায় (এটা একটায়) সারা পৃথিবীর হাজীরা সেখানে হজ্জ করতে যায়। মসজিদ গুলো নির্মিত হবার হিসাব হলো, ভৌগলিক ব্যসার্ধের ক্যালকুলেশন করে কাবাকে কেন্দ্র করে, মসজিদগুলো সমন্বয় করে কাবার সম্মুখে রেখে তৈরী করা হয়। বর্তমানে স্যাটেলাইটের যুগ, এই স্যাটেলাইট দ্বারা কাবা ঘরে কী কী আছে, সেইগুলো আধুনিক প্রযুক্তি বা যন্ত্রপাতি দ্বারা আমাদের কাছে উপস্থাপিত হচ্ছে। কিন্তু সেটা যে আল্লাহ্‌র ঘর, সেখানেও আল্লাহ্‌র দেখা মিলছে না। আল্লাহ্‌কে যদি না দেখা যায় বা না মেলে, তাহলে এই রুপের কার্যকারিতার প্রতিফলন বাস্তবায়ন কী করে হবে ?

তাই এটা হলো বিশেষ ব্যবস্থার ঘর। এটা সারা পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। বহু নবী-রাসুলের আবির্ভাবকৃত ব্যবস্থায় এই কাবা কেন্দ্রিক অনেক ঘটনা প্রবাহ রয়েছে। যার কারণে এটাকে মুসলিম উম্মার জন্য বিশেষ ভাবে রাখা হয়েছে। কোরানুল মাজিদেও আসছে যে, অনেক সময় এই ঘরকে রক্ষা করবার জন্য স্রষ্টার পক্ষ থেকে গায়েবি ভাবে হেফাজত করা হয়েছে। যার কারণে মুসলিম উম্মার কাছে এটা এত বেশি সম্মানে ভূষিত বা মূল্যবান হয়েছে।

তাহলে সেখানেও আল্লাহ্‌কে পেলাম না। যদি আল্লাহ্‌কে পাওয়া যেত, তাহলে যাদের সেখানে যাওয়ার মত সামর্থ্য আছে তারা সকল কিছু দিয়ে হলেও সেখানে গিয়ে অন্তত আল্লাহ্‌র একটু সাক্ষাত লাভ করত। যার রুপ স্থায়িত্ব পাবে, তাঁর খোঁজাখুঁজি বা ব্যবস্থায়নটুকু জারী করা যেত। তাহলে সেখানেও আল্লাহ্‌র চেহারা দেখা হলো না। তাহলে শুধু থাকবে তোমার রবের চেহারা, জামালিয়াত এবং কামালিয়াতের দুইটি রুপ। এটা চিরসত্য বাণী। তাহলে আল্লাহ্‌র চেহারাটার উৎঘাটন কী দিয়ে করা হবে। সেই রুপ লাভ কি দিয়ে হবে ?

এজন্য কোরানুল মাজিদের সুরা নিসার ৮০ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ্‌পাক বলেছেন:- যে লোক রাসুলের হুকুম মান্য করল, সে আল্লাহ্‌র হুকুমই মান্য করল। অপর আয়াতে (১৫০-১৫৩ মিলিত ভাবে) বলা হয়েছে-

যাহারা ইচ্ছা করিল রাসুল আর আল্লাহ্‌র মধ্যে ভাগ করিতে, তাহারাই খাঁটি কাফের। সুরা আল-ইমরানের ৩১ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ্‌পাক বলেছেনঃ- যদি আল্লাহ্‌র ভালবাসা চাও তাহলে রাসুল (সঃ) কে অনুসরণ কর। রাসুল (সঃ) বলেছেনঃ- শেষ বিচার দিবসে আমার সাফায়াত হবে মুসলিম উম্মার মধ্যে তাদের জন্য, যারা আমার আহলে বায়াতকে ভালোবাসে (তারিখে বাগদাদ, খন্ড–২. পৃষ্ঠা নং–১৪৬ঃ কানযুল উন্মাল, খন্ড–৬, পৃষ্ঠা নং২১৭)।

অর্থাৎ আল্লাহ্‌পাক বলছেন যেঃ- আমাকে পেতে চাইলে আমার হাবিবকে অনুসরণ কর। আর আল্লাহ্‌র হাবিব বলেছেন, আমাকে পেতে চাইলে আমার আহলে বায়াতকে আঁকড়ে ধরতে হবে। এই আল্লাহ্‌র রুপকে দেখার যে ব্যবস্থা, সেটাই হলো এই আহলে বায়াত কর্তৃক ব্যবস্থা বা পথ। তাহলে এই আহলে বায়াতকে ধরে তাঁর হাবিবকে পেতে হবে। আর হাবিবকে পেলে আল্লাহ্‌কে পাওয়া যাবে। এই যে শিঁকলের মত একটি বলয় ব্যবস্থায়ন রাখা হয়েছে। এজন্য অনেক মাশায়েখগণ বলে থাকেন মোর্শেদ হলো রাসলু (সঃ) কে দেখার আয়না, আর রাসুল (সঃ) হলো আল্লাহ্‌ দেখার আয়না। তাহলে এটা হলো ভার্সেস বা রুপান্তর ব্যবস্থা।

এই যে রুপের কার্যকারিতার ব্যবস্থায়ন, সেই ব্যবস্থায়ন মোর্শেদ কর্তৃক ব্যবস্থা। এখান থেকেই এর সূচনা বা অগ্রযাত্রা। এই অগ্রযাত্রা হলো যেমনঃ- একটি বীজ যখন মাটিতে পোঁতা হয় তখন সেই বীজটা ধীরে ধীরে পরিস্ফুটন হয়। যখন বীজটা ফুঁটে তখন তার দুইটি পাতার অবয়ব জারী হয়। এই দুইটি পাতার বিভাজন থেকে ধীরে ধীরে ক্রমাগত ভাবে একটি বিশাল বৃক্ষে রুপান্তরিত হয়ে যায়। তাই এই মোর্শেদ প্রদত্ত ব্যবস্থায় রুপের যে জালুয়া, সেটা এই বীজ রুপে প্রাথমিক কার্যটুকু সম্পন্ন হয়। সেই বীজটাকে ধীরে ধীরে একটি বিশাল বৃক্ষে রুপান্তরিত করতে হয়। এই ব্যবস্থায়নই ওলিদের শিক্ষা। তাহলে ব্যবস্থায়ন করতে হলে কী করতে হবে, মোরাকাবা মোশাহেদা করতে হয়। এটা আধ্যাত্মিক প্রণালীর ব্যবস্থা। জাগতিকভাবে এই রুপের কোন অস্তিত্ব রাখাই হয় নি। আধ্যাত্মিকতা যদি জাগতিক ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত নীতিতে কার্যকরি থাকত, তাহলে জাগতিক যে রুপক ব্যবস্থা কার্যকরি রয়েছে সেটা আর থাকত না। অর্থাৎ আবরণের পর্দা থাকত না। এজন্য সত্য বড় তেঁতো হয়ে যায়, সত্য বড় উলঙ্গ হয়ে যায়, সত্যের কোন পোশাক লাগে না।

সত্য সদা উলঙ্গ চলতে পারে কিন্তু মিথ্যা পোশাকহীন চলতে পারে না।

তাহলে যুগে-যুগে, কালে-কালে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যত প্রতিনিধিগণ আগমন করছেন, তাঁরা সবাই এই আধ্যাত্মিক প্রণালির সাধনা দ্বারা স্রষ্টার রুপ বা চেহারা লাভ করেছেন। এই লাভ করবার পর তাঁর অনুমতি স্বাপেক্ষে তাঁর প্রতিনিধি হয়েছেন। তাহলে সেই প্রক্রিয়ার কার্যক্রম আজকে আমরা মানতে রাজি না। কেন ? এটা হলো কষ্টের। তাহলে ধর্মীয় অনুভূতিতে যারা শিক্ষা দিয়েছেন, তাঁরা সবাই এই কষ্টের মাধ্যম দিয়ে এই অর্জিত ব্যবস্থায় সুফল পেয়েছেন। আর আমরা এই কষ্ট করতে রাজি না, যার কারণে আমাদের সুফল হয় না। কারণ একটি সুন্দর ব্যবস্থাকে যদি উপস্থাপিত করা হয়, তাহলে দেখা যায় সেটা একটি আবরণকৃত কভারের সিস্টেমে রাখা হয়। যেমন একটি মোবাইল যদি আপনি দোকানে কিনতে যান, তাহলে সেটাও একটা সুন্দর প্যাকেজিং সিস্টেমের মধ্যে রাখা রয়েছে, যার কারণে নিরাপদ ও সুন্দর দেখা যায়। তাই এই বাহ্যিক যে সকল বিষয়গুলো রয়েছে এটা হলো সুন্দর। কিন্তু ভিতরে যদি সুন্দর না থাকে তাহলে এর সুন্দর কী দিয়ে হয় ? প্যাকেটের চাকচিক্য দিয়ে কার্যকারিতা পাবে ? পায় না।

যেখানে আল্লাহ্‌ বললেন যে:- রব্বিল মাশরেকে ওয়াল মাগরেবে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াত্তাখিজু ওকিলা। অর্থ:- পূর্ব পশ্চিমের যে দিকেই তাকাও না কেন, আমি আল্লাহ্‌ ব্যতিত কিছুই দেখতে পাবে না, উছিলার অন্বেষণ কর। এই আয়াতে কারিমাতে উছিলার কথা বলা হয়েছে। এই উছিলাটাই হলো পীর বা মোর্শেদ। তাহলে সেই উছিলার অন্বেষণ করলে রবের চেহারা পাওয়া যাবে, এভাবে বর্ণনায় আসলো। তাহলে সেই উছিলাকে আঁকড়ে ধরবার কথা বলা হয়েছে।

কালামপাকে বলা হয়েছে:- ওয়া ইয়াবকা ওয়াযুহু রব্বুকা, ওয়া জুল জালালি ওয়াল ইকরাম। অর্থ:- শুধু থাকবে তোমার রবের চেহারা, জামালিয়াত এবং কামালিয়াতের দুইটি রুপ। এই রবের উদ্ভাসনকৃত পথটা হলো এমন। হাদিস শরীফে আসছে যে, কেউ যদি বিনা তাহকিকে কলেমা পড়ে, তাহলে সে ফাসেক। এই কলেমার যে রুপ স্থানান্তরিত ব্যবস্থা, সেটাই এই মোর্শেদের সামনে তাঁর চেহারার সনদকৃত ব্যবস্থায় আমি আমার ঈমানে চুক্তিবদ্ধ হলাম।

এই চেহারা দ্বারা আল্লাহ্‌র চেহারাকে উৎঘাটন করতে হবে। অর্থাৎ রুপান্তর ভার্সেস বা পরিবর্তিত ধারা। হযরত আমীর খসরু (রহঃ) বলেছেনঃ- পীর পারাস্তী হক পারাস্তী। অর্থঃ- পীর পুঁজাই আল্লাহ্‌র পুঁজা। এজন্য অনেক সাধকগণ বলে থাকেন যেঃ- আমি আল্লাহ্‌কে চিনিনি, আমি খোদাকে চিনিনি, আমার খোদা যিনি, আমার রাসুলও তিঁনি, তিঁনিই মোর্শেদ, সকল বিষয়েই তিঁনি, তিঁনিই সব। কারণ আমিতো তাঁর দ্বারাই এই অবস্থাতে অবলোকন করতে পেরেছি।

যেমন মুনছুর হাল্লাজ তাঁর সাধনার কার্যে যখন পরিপূর্ণতা লাভ করে, তখন মহান স্রষ্টা জিজ্ঞাসা করে, কে তুমি ? মুনসুর হাল্লাসের ভিতর থেকে আওয়াজ আসে, আমিই তুমি। এই ব্যবস্থায়নে চূড়ান্ত পর্যায়ে গেলে এমন হয়। অর্থাৎ প্রাথমিক সংকলন যে ব্যবস্থা, সেটা হলো পীরের আশ্রিত একটি রুপ বা ধারা। সেই ধারাবাহিকতার তাগিদে মানুষ যদি যথাযথ ভাবে প্রয়োগ পদ্ধতিতে ঘসে ঘসে সুন্দর মসৃন করতে করতে যদি সেই পর্যায়ে নেওয়া যায়, তাহলে তখনই সেটা হয়। তাই মুনসুর হাল্লাজের কথাটা আমাদের সবার জন্য কার্যকরি না।

তাহলে সূত্র হলো এই মোর্শেদ প্রদত্ত ব্যবস্থার মাধ্যম দিয়ে স্রষ্টার রুপ উৎঘাটন হয়। তা না হলে আয়াতে কারিমায় সুস্পষ্ট ভাবে বলে দিয়েছে, পূর্ব পশ্চিম যে দিকেই তাকাও না কেন, আল্লাহ্‌ ব্যতিত কিছুই দেখতে পাবে না। যে দিকেই তাকাবে সে দিকেই আল্লাহ্‌র চেহারা দেখতে পাবে। আসলে সবই দেখি তাঁর সৃষ্টির গুণাগুন বা সৃষ্টির জীব বৈচিত্র থেকে শুরু করে সকল কিছুই চোখে পড়ে কিন্তু যিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁকেই চোখে পড়ে না।

তাহলে কোরানের ভাবধারা বুঝতে হলে আমাদের আধ্যাত্মিক প্রণালীর মাধ্যমে এটা বুঝতে হবে কিন্তু এইটা বেশির ভাগ মানুষই মানে না। যদি মেনে নেয় তাহলে তাদের আর এই ব্যবসায়িক কেন্দ্রিক বা নিজেদেরকে অহমিকা বা বড়াইয়ের যে মানদন্ড এইটা আর থাকবে না। তারা বুঝতে পারে এজন্য মানে না। কিন্তু কে মানবে কে মানবে না সেটা বিষয় না। আমার পীর ও মোর্শেদ কেবলা কাবা উনি একটা কথা বলে থাকেন যে, আমার ৫৩ বছরের জিন্দিগিতে কোরানের রিসার্সকৃত ব্যবস্থায় আমি একটি কথাই পেয়েছি। সেটা হলো আমি কোরানের কিছুই বুঝতে পারলাম না।

তাহলে এই কিতাবের বাণীগুলো হলো এমন। তা না হলে আমরা এই আয়াতে কালাম পড়ার সাথে সাথে, দৃষ্টি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্‌র চেহারা পেয়ে যেতাম। তাহলে আর কোন দ্বিধা দন্ড বা সংশয় থাকত না। তাহলে এটা একটি রহস্যময় কিতাব। যার রহস্য উৎঘাটন করতে হলে এই মানুষকে সেই রহস্যের ভান্ডারের মধ্যে ডুব দিতে হবে। সেই ডুবন্ত ব্যবস্থা থেকে ডুবুরির মত তাঁর অনুশীলনগামী প্রক্রিয়ার মাধ্যম দিয়ে তাঁর প্রকৃত ধারাবাহিকতার আলোকে সেটাকে উৎঘাটন করতে হবে। তাহলে সেই উৎঘাটনকৃত ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সকল কিছু সৃজন করতে পারলে তবেই তাঁর কাছে এটার আর কোন ধোঁয়া বা কুয়াশার অবকাশ থাকবে না। অর্থাৎ চূড়ান্ত ফায়সালায় সেই রুপটাই স্থায়ীভাবে থেকে যায়।

তাহলে আয়াতে কারিমায় বলা হলো:- ওয়া ইয়াবকা ওয়াযুহু রব্বুকা, জুল জালালি ওয়াল ইকরাম। অর্থ:- শুধু থাকবে তোমার রবের চেহারা, জামালিয়াত এবং কামালিয়াতের দুইটি রুপ। এই আয়াতে কারিমা দ্বারা আমরা দুইটি রুপকে বিভাজনকৃত অবস্থায় পেয়ে থাকি। একটা হলো জামালিয়াতের এবং আরেকটা হলো কামালিয়াতের ধারা। জামালিয়াত এবং কামালিয়াত দুই শব্দটাই হলো আধ্যাত্মিক প্রণালীতে। জাগতিক ভাবে এই জামালিয়াত এবং কামালিয়াতে কোন অস্তিত্ব রাখা হয় নি। শুধু বলা হয় আমলের দ্বারা মানুষ আউলিয়া হয়ে যাবে। কিন্তু সেই আমল পদ্ধতিগত ভাবে না করায় আমরা সেই রুপকে পাচ্ছি না। এজন্য ওলি মাশায়েখগণ বলেছেন যে, তোমরা যদি পীর বা মোর্শেদের কাছে আত্মসমর্পণ না কর বা মুরিদ না হও, তাহলে হাজার বছর বন্দেগী করেও কবুল হবে না। লা শাইখ ইল্লা ইবলিস। অর্থ যার পীর নেই তাঁর পীর হলো শয়তান। তাহলে শয়তান যদি তার পীর হয়, তাহলে তার বন্দেগী কবুল হবে কী করে ? তাই রুপান্তরবাদের প্রার্থক্যটা এমন হয়।

যারা পীর বা মোর্শেদ মানে না, তারা অকপটে এমন কথা বলে থাকেন যে, ইবাদত বন্দেগীর মাধ্যম দিয়ে সব হয়। যদি তাই হবে তাহলে এই মতবাদ বা পথের তো কোন প্রয়োজন পরে না। সবাই এক কাতারে একই রাস্তাতে যদি সমাসীন হত, তাহলে সেটা আরও বেশি সৌন্দর্য্যময়! তাহলে এখানে একটি কথা এসে যায়, সেটা হলো:- জগৎ সংসারে যত ওলি মোর্শেদগন এসেছেন তাঁরা সবাই বলছেন যে একজন পীর বা শিক্ষকের কাছে তোমাকে সারেন্ডার বা বায়াত হতে হবে। এটাই তাদের সংবিধান যে, আহলে বায়াতের দাওয়াতটা পৌঁছে দেওয়া।

সেটা যদি কেউ গ্রহন করে তাহলে সেটা তার একিন আর যদি সে বর্জন করে সেটাও তার একিন। কিন্তু তিঁনি যে সত্যের দিশা লাভ করেছেন, তাই তাঁর পক্ষ থেকে এই আহ্বান থাকে যে, তুমি একজন পীর বা মোর্শেদ নির্বাচন করে তাঁর কাছে বায়াত বা মুরিদ হও।

তাহলে এই প্রক্রিয়াতে যত ওলি মোর্শেদগণ এসেছেন সবার কার্যকারিতায় একই বিধান জারী ছিল। ওলিদের বিধানাবলি যদি ঠিক হয়ে থাকে, তাহলে বাদবাকি বিধান সম্পর্কে যারাই আমাদের ধর্মীয় শিক্ষা দেয় বা আলোকপাত করে তা সঠিক নয়। সবাই যদি এক ধারায় থাকে তাহলে বিভাজনের তো প্রক্রিয়ায় আসে না। বিভিন্ন দল, উপদল বা গোত্রের যে বিভাজন, সেটা নিজেদের মধ্যে সমন্বয়হীনতার কারণে হয়েছে। মূলের তো কোন বিভাজন নেই, আল্লাহ্‌র কোন বিভাজন কেউ দেখাতে পারেনি বা এইটা নিয়ে কোন মতানৈক্য হয় নি, দল বা গোত্রের বিভাজন হয় নি। রাসুল (সাঃ) কে নিয়ে তো কোন মতানৈক্য বা বিভাজন হয় নি। রাসুলের (সঃ) সাহাবাগণ সবাই তাঁকে অবনত মস্তিষ্কে তাঁকে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি হিসাবেই মেনে নিয়েছে।

তাহলে বিভাজনের উৎপত্তিটা কোথায় ? বিভাজনের উৎপত্তিটা হলো এই দর্শন প্রক্রিয়ার সঙ্গে একে অপরের সমন্বয়হীনতা। এই সমন্বয়হীনতার কারণে বিভাজন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কেউ আনুষ্ঠনিক সালাতে হাত বুকের উপর বাঁধে, কেউ বা আবার হাত নাভির উপর বাঁধে। আবার অনেকে হাতই বাধে না তারাও একটি দল। এভাবে আমরা ভিন্নতার বা দলাদলির অবয়বে চলে গেছি। যদি সত্যের দর্শন থাকতো তাহলে আমরা দলাদলিতে লিপ্ত হতাম না। আসলে এগুলোর কোন অস্তিত্ব নেই। আপনি হাত রাখলে কি বা না রাখলেই কী ? কাজ তো হবে ভিতরগত ব্যবস্থায়। ভিতরে যদি মওলা না থাকে তাহলে তো আপনি লাশ, আপনার অস্তিত্বই নেই। তাহলে ভিতরে যার কার্যকারিতা ফলে তাঁর বিষয়ে আমরা বেশির ভাগই অনুগামী না বা তাঁর বিষয়ে আমরা কেউ চৈতন্য না। যার কারণে এক অন্ধ আরেক অন্ধকে বলে “দে লাথি কোন সমস্যা নেই” লাথিটা কোথায় লাগবে সেটাই তো সে দেখে না, বলার কথা সে বলে দিয়েছে। এভাবে রুপক আকৃতির দল বা বিভাজন প্রক্রিয়া চলমান হয়েছে। যদি দর্শন থাকত বা পরস্পরের মধ্যে সত্যের প্রতিযোগিতা হত তাহলে এই বিভাজন আর থাকত না।

তাই এই আধ্যাত্মিকতার ধারাবাহিকতায় বর্ণনাটা হলো জামালিয়াত এবং কামালিয়াত। এই দুইটি ধারাই হলো স্রষ্টা কর্তৃক প্রণিত সনদের মাধ্যমে এটা হয়ে থাকে। জামালিয়াতের রহস্য যদি কেউ লাভ করতে চায়, তাহলে স্রষ্টার সান্নিধ্য ব্যতিত সেই রহস্য লাভ হয় না। যার কারণে এই জামালিয়াত এবং কামালিয়াতের দুইটি রুপের পূর্বেই কালাম পাকে এসেছেঃ- ওয়াযুহু রব্বুকা, অর্থঃ- তোমার রবের চেহারা। এই রবকে হাজির নাজির দ্বারা এই পথের কার্যাবলি সম্পন্ন হয়।

আমরা সংক্ষিপ্ত আকারে একটা কথা বলে থাকি সেটা হলো, জামালিয়াতের রুপ হলো স্রষ্টার সন্তুষ্টি জ্ঞাপনকৃত একটি রুপ। আল্লাহ্ যদি দয়া করে, তাঁর দয়ার পর্বসে এই জামালিয়াতের রুপটা সে লাভ করতে পারে। এটা সবার জন্য নয়। সবাইকে দয়া করবে এমন না আহামরি ব্যবস্থা এটা না। সবাইকে দয়া করলে পৃথিবীতে যত মানুষ রয়েছে আল্লাহ্ সবাইকে এই ব্যবস্থা জারী করে দিতে পারে। তাহলে আর কিছু লাগে না। কালাম পাকে আল্লাহ্পাক বলছেন যেঃ- আমি ইচ্ছা করলে মুহূর্তে সকল মানব মানবীগণকে মুসলমান করে দিতে পারি, কিন্তু না, রাখিয়া দেই পরীক্ষার উদ্দেশ্যে।

তাহলে আমি আপনি দুনিয়াতে এসেছি পরীক্ষা স্বরুপ। এই পরীক্ষায় সফল হলে আমাদের জন্মের স্বার্থকতা হলো। আর পরীক্ষায় যদি আমি আপনি বিফল হই, তাহলে পুনঃরায় প্রবর্তিত ব্যবস্থায় যা লাভ করবেন সেটাই আপনাকে দেওয়া হবে। আল্লাহ্পাক বলেছেনঃ- কারো সাথে এক জার্‌রা পরিমাণ ইনজাস্টিস করা হবে না। যার যার উপার্জন তাকেই দেওয়া হবে। আজকে আমি যা ভোগ করি, সেটা আমার পূর্ব জন্মের কর্মফলের অনুযায়ী প্রাপ্তি হয়েছে। আর এই জন্মে যা কামাই করি তা পরবর্তী জন্মে ভোগ করতে হবে। এই কথা গুলো বারবার বলার উদ্দেশ্য হলো সাবধান বা সতর্ক হবার জন্য। মূল ধারাকে লাভ করবার জন্য প্রচেষ্টায় লিপ্ত হন। যে উদ্দেশ্যে আপনাকে প্রেরণ করা হয়েছে, সেই দিকে ধাবিত হয়ে পূর্ণতা লাভ করেন।

আল্লাহ্পাক কালামপাকে বলেছেনঃ- ওমা খালাকতুল জ্বীন্নি ওয়াল ইনসি ইল্লা লিয়াবুদুন। অর্থঃ- আমি জ্বীন এবং ইনসানকে একমাত্র আমার দাসত্ব করবার উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছি। এই কথাকে ঘুরিয়ে মোডিফাই করে বলা হয়েছে যে,

জ্বীন এবং ইনসানকে আমার ইবাদত বন্দেগী করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। কোথায় দাসত্ব আর কোথায় ইবাদত বেন্দেগী ? মূল ধারাই নাই। কারণ আল্লাহ্ এবং রাসুল (সঃ) এই দুইয়ের উদ্ধারকৃত যে পথ সেটাই তো দাসত্ব। সেটা যে প্রক্রিয়ায় হোক না কেন তাঁর প্রাপ্তি সুনিশ্চিত করাটাই হলো মূল বিষয়। তাই দাসত্ব করে এই পথে উপার্জনকৃত ব্যবস্থায় লাভ করতে হয়। যদি দাসত্ব মেনে নেয় তাহলে আহামরি ব্যবস্থাগুলো আর থাকেনা। এই গদি, আসন চেয়ার, সম্মান আর থাকে না। কারণ সবাইকে তখন দাসত্বের শৃংখলে বন্দী হয়ে এই দাসত্বের শৃংখল থেকে নিজেকে বের হতে হয়। এজন্য এটা সবাই মানতে পারে না। অহমিকা, অহংবোধ শয়তানি বা মন্দ সত্ত্বা তাদের মধ্যে কাজ করে।

এই ইবলিশের উৎপত্তি স্থল নিয়ে যদি কেউ চিন্তা করে তাহলে তার কাছে পরিষ্কার একটি ধারণা কাজ করে। আদমকে সবাই সেজ্দা দিলেন একমাত্র অহকাংরী দিলেন না। এটাই হলো দাসত্বের স্বীকৃতি। আযাজিল অহংবোধ, অহংকার করার কারণে সে আদমকে সেজ্দা না দিয়ে শয়তানের খেতাব পেলেন। আল্লাহ্পাক আযাজিল (আঃ) কে জিজ্ঞাসা করলেন তুমি আদমকে কেন সেজ্দা দিলে না ? আযাজিল (আঃ) বললেন:- আনা খায়রুম মিনহু। অর্থ আমি আদম হইতে উত্তম। আযাজিল যে আদম হইতে উত্তম এইটাই হলো তার অহংবোধ বা অহংকার। যদি আদম হইতে সে নিজেকে ছোট ভাবতো তাহলে সে আদম (আঃ) কে সেজদা দিয়ে দিত। এই অহংকারবোধ পরিত্যাগ করতে পারেন নাই বলেই রুপকতার এত সম্প্রসারণ করা। আমরা সবাই এই অহং প্রিয়। তাই অহংবোধকৃত ব্যবস্থায় এই জামালিয়াতে রুপের কোন দর্শন হয় না। কারণ এটা হলো স্রষ্টার বিশেষ দানকৃত ব্যবস্থার পথ। এই পথে যদি সে কঠোর রিয়াজত বা সাধনার দ্বারা, সেই মাধ্যম দিয়ে যদি সে উপন্নিত হয় এবং মালিকের পক্ষ থেকে যদি তার উপর দয়ার পর্বস হয়, তাহলেই সে এই জামালিয়াতের রুপের নিদর্শন লাভ করতে পারে।

আর কামালিয়াত এটা একটি দানকৃত ব্যবস্থার মধ্যে সমাসীন। অর্থাৎ তাঁর প্রতিনিধিত্বের ধারাবাহিকতার যে রেওয়াজ রয়েছে, সেই রেওয়াজ অনুযায়ী হাঁটলে এই যোগ্যতার মানদন্ডে এটা অবারিত ভাবে চলমান থাকে। কারণ এটা হলো একটি সিস্টেম্যাটিক্যাল বা পদ্ধতিগত ধারা। এজন্য প্রত্যেককে মুরিদ বা

বায়াত হবার জন্য অনুশীলনগামী ব্যবস্থায় তাগিদ করা রয়েছে। আল্লাহ্পাক কালামপাকে বলেছেন:- কুলুবিন মুমিনিন আরশে আল্লাহ্। অর্থ:- মমিনের কলবই হলো আমার (আল্লাহ্র) বসিবার স্থান। তাহলে বান্দায় যখন মমিনে পরিণত হয়, তখন মমিনের কলবটাই আল্লাহ্র ঘর হয়। তাহলে আমরা যে রুপক আকৃতির আল্লাহ্র ঘর দেখি, এই মমিনের কলব থেকেই সৃজনকৃত ব্যবস্থায় এটা রুপক ভাব ধারায় এসেছে এবং মমিনের কলব থেকেই কাবার উৎপত্তি হয়। সেই কাবা থেকে রুপান্তর বাদে মসজিদ হয়। এভাবে রুপকতার মানদন্ড পার হতে হতে যখন মূলের ধারায় পৌঁছায় তখন এই জ্যান্ত কাবা এভাবে হয়ে যায়। এজন্য সাধকগণ বলেছেন যে, আমি জ্যান্ত কাবার উপাসনাতে লিপ্ত থাকি। কারণ মানুষ তার শ্রম, কষ্ট সাধনার দ্বারা যে কাবা নির্মাণ করেছে ওটা হলো ইট শুড়কির বালুর কাবা। মৃত কাবার মত দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু একজন মানুষ যদি মমিনে পরিণত হয়ে যায় তাহলে তাঁর কলব বা হৃদয় আল্লাহ্র ঘর বা জ্যান্ত কাবায় পরিণত হয়। এই সিস্টেম্যাটিক্যাল পদ্ধতিতে এটা সুসম্পন্ন হয়। এই সুসম্পন্নকৃত ব্যবস্থায় হলো কামালিয়াত। তাহলে এই কামালিয়াতে যিনি অবস্থান করেছেন বা নামটা লিপিবদ্ধ করেছেন, তাঁরই কামালিয়াতের ধারাবাহিকতা হলো অবিনশ্বর বা ধ্বংসশীল নয়।

তাহলে আল্লাহ্পাক কালামপাকে বলেছেন:- কূল্লুমান আলাইহা ফান। ওয়া ইয়াবকা ওয়াযুহু রব্বুকা, জুল জালালি ওয়াল ইকরাম। অর্থ:- সকল কিছুই ধ্বংসশীল। শুধু থাকবে তোমার রবের চেহারা, জামালিয়াত এবং কামালিয়াতের দুইটি রুপ। তাই সাধকগণ এই রবের চেহারা উৎঘাটনের জন্য বছরের পর বছর আত্ম অনুশীলনে নিজেকে নিয়োজিত করে, ধীরে ধীরে তরান্বিত হতে হতে এই পদে উপন্নিত হয়। এটাই ওলিদের দেখানো পথ। মোরাকাবা মোশাহেদা আর রিয়াজতকৃত অনুশীলনগামী ব্যবস্থার মাধ্যম দিয়ে সবাই কামেল হয়, সবাই মমিনে রুপান্তরিত হয়। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় এগুলো যদি স্থান করে, তাহলে জগতে যে সকল রুপক বিধি বিধান আমরা দেখে থাকি এগুলো কিছুই থাকবে না। এজন্য বাতেনির আগমন হলে জাগতিক বিলুপ্ত হয়ে যায়। এজন্য বাতেনি ব্যবস্থাকে আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখতে বলা হয়েছে। তাই তরিকত, হাকিকত, মারেফত এগুলো হলো গোপন পথ। আপনাদের মনে প্রশ্নের উদয় হতে পারে যে, এই পথগুলো গোপন কেন?

আসলে জাগতিক বিধি বিধানকে সুন্দর বা সমন্বয় রাখতেই গোপন ব্যবস্থায় রাখা হয়েছে। আজকের জামানায় ধর্ম নিয়ে যে বিভেদ, মতানৈক্য আর বিড়ম্বনা তৈরী হয়েছে। যার পরিপ্রেক্ষিতে ওলি মাশায়েখগণ এ বিষয়গুলো আত্মপ্রকাশ না করে আর থাকতে পারে নি। যার জন্য ওলিদের বিভিন্ন কিতাবে বা কিতাবস্ত করে মানুষের দোরগোঁড়ায় তুলে ধরবার চেষ্টা করছেন। ইংরেজিতে একটি প্রবাদ বাক্য আছে যে, সামথিং ইজ বেটার দ্যান নাথিং। অর্থ:- নাই মামার চেয়ে কাঁনা মামাই ভাল। যখন ধর্মের প্রতি মানুষ উদাসীন বা বিমুখতা হয়ে যায়, তখন ধর্মের কোন কার্যকারিতা ফলে না। এজন্য এই রুপকটাও তখন একটি বার্তা বহন করে কার্যকারিতার রুপ ধারণ করে রয়েছে। কারণ মূলের দিকেই তো কেউ যেতেই চায় না। তাহলে ধর্মটা সংরক্ষণকৃত ব্যবস্থায় থাকবে কী করে ? তাই রুপকটা কাঁনা রুপে রাখা হয়েছে।

মানুষ যদি প্রতিযোগিতায় জামালিয়াত এবং কামালিয়াতের রুপ এভাবে উৎঘাটনের ব্যবস্থায় লিপ্ত থাকত, তাহলে এই বিধি বিধান কাঁনা ছেলের নাম পদ্মলোচন হত না। কাঁনা, কাঁনা হিসাবেই স্বীকৃতি পেয়ে যেত। কারণ মুসলিম উম্মাহর পরস্পরের যে দর্শন, সেটা হলো একজন মুসলিম অপর মুসলিমের দর্পন বা আয়না স্বরুপ হুবহু দেখা যাবে। এই দেখার প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানান দেওয়া বা জ্ঞাত করা হয়েছে। তাহলে এই দেখা কী ? আসলে সত্যের উন্মেষ বা জাগরণ হলে এই দর্শনবাদ হাজির নাজির হয়। তাহলে সেই প্রক্রিয়াতে আমরা কেউ সহজে যেতে চাই না। কিন্তু মূল যেভাবে প্রাপ্তি লাভ হয় সেদিকে ধাবিত হতে হবে।

জগতে যা কিছু উপার্জন বা সংরক্ষণ করেন না কেন, কোন কিছুই স্থায়ী না। কারণ আল্লাহ্পাক কালামপাকে সুস্পষ্ট ভাবে বলেছেন:- কূল্লুমান আলাইহা ফান। ওয়া ইয়াবকা ওয়াযুহু রব্বুকা, জুল জালালি ওয়াল ইকরাম। অর্থ:- সকল কিছুই ধ্বংসশীল। শুধু থাকবে তোমার রবের চেহারা, জামালিয়াত এবং কামালিয়াতের দুইটি রুপ। তাই এই দুইটি রুপ হলো স্থায়ী রুপে থেকে যাবে, ইহার কোন ধ্বংস নেই। আর যা কিছু রয়েছে সকল কিছুই ধ্বংসশীল। মূল ধারার যা স্থায়ী বা ধ্বংসশীল নয়, সেই ধারার উপার্জন বা কামাইটুকু যদি

আপনি করতে চান, তাহলে এই দুইটি রুপের সাধন ভজনে আপনাকে জয়যুক্ত হতে হবে। আপনি যদি জয়লাভ করতে না পারেন তবুও তো আপনার বিবেকের কাছে শান্তনা থাকবে।

যে আমি সফল হতে পারি নি কিন্তু আমার অনুশীলন বা পরিগমনের ভাবধারা ছিল এই দুইটি রুপকে লাভ করা। এই সকল বিষয় হলো আধ্যাত্মিক প্রণালীতে একটি দেহকে জাগরণকৃত ব্যবস্থা। তাই এই ব্যবস্থা সম্পর্কে যারা জ্ঞাত রয়েছে তাঁরা এই বিষয়ে সুশিক্ষাটা দিতে পারেন। আর যারা এ বিষয়ে জ্ঞাত নেই তাদের রুপক আকৃতি বা কাগজের কিতাব দ্বারা আপনাকে বলে দিবেন। কিন্তু কিতাবে তো শুধু লেখা থাকে। পুস্তগত বিদ্যায় মানুষ এত বেশি ঝুঁকছে যে মানুষ এই অনুশীলনগামী ব্যবস্থা মানতেই চায় না। মানুষ যদি এই কাগজের কিতাব কিনে পাঠ করে, সে যদি কল্যাণকর হয়ে যেত বা আল্লাহ্ওয়ালা হয়ে যেত, তাহলে মানুষ ওলি বা মোর্শেদ প্রদত্ত্ব পথে যেত না। আল্লাহ্র ওলি বা মোর্শেদ প্রদত্ত সমস্ত বিধানাবলি আর দুনিয়াতে স্থান পেত না ? তাই যিনি অনুশীলনগামী প্রয়োগ পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করেছেন, তাঁর কাছেই এই সঠিক শিক্ষাটা থাকে। জামালিয়াত এবং কামালিয়াতের রুপ প্রাপ্তির ব্যবস্থায়ন যাদের জারী হয়েছে, তাঁদের কাছে এই সমস্ত কাগজের বা পুস্তগত বিদ্যায় পূর্ণতা নেই। তাদের কাছে এই সমস্ত কথার কোন মূল্য থাকে না। হযরত ওসমান (রাঃ) যখন কোরান সংকলন করলেন, তখন এই বিষয়টা এক সাহাবী মওলা আলী (আঃ) কে জানালেন, তখন হযরত আলী (আঃ) বললেন যে:- রাখেন আপনার সংকলিত কোরান, আমি আলী (আঃ) জীবন্ত কোরান।

তাহলে কোরান জীবন্ত হয়, এটা কিভাবে হয় ? এই প্রয়োগ পদ্ধতিতে আমরা হাঁটি না, যার কারণে এই মূল্যবান বাণী জাগতিক আলেম সমাজ প্রচার করেন না। ওলিরা এই কোরানের আয়াতকে ঘষে ঘষে তাঁর দেহের উপরে কার্যকারিতার প্রতিফলন ঘটায়, এভাবেই এই জীবন্ত কোরান হয়। এজন্য একজন সাধক তার বাণীতে বলেছেন যে:- "আল্লাহ্র দেওয়া কালামপাকের একটি হরফ যদি কারো নসিব হয়, তার জন্য দোযখ হারাম এই কথা কোরানে কয়"। তাহলে এটা রুপক আকৃতিতে বলা হয়েছে। রুপক আকৃতিতে বলার কারণ হলো জাগতিক বিধি বিধানে যেন কারো আঘাত না লাগে। যার জন্য সাধকের রচনাবলি এমন কৌশলের হয়।

যিনি এই রাস্তায় চলমান রয়েছেন, তার মনের মধ্যে এটা উদ্ধারের জন্য চিন্তা আসবে। আর এই চিন্তা থেকে উত্তরণের ব্যবস্থা সে খুঁজবে। এই প্রক্রিয়াতে এই কার্যক্রমগুলো সম্পন্ন করতে হয়। তাই সবাইকে এরকম মানসিকতা তৈরী করতে হবে। যেটা স্রষ্টার স্থায়ীত্ত্বের রুপ, এই রুপকে উদ্ধারকৃত ব্যবস্থার যে পথ, এই পথ আমরা কী দিয়ে পাবো এবং এটা কী দিয়ে কার্যকারিতা ফলাবো, সেই বিষয়ে আমাদের মনোনিবেশ করতে হবে। সেই শিক্ষাটা যেখানে আছে সেখানে আমাদের ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে বা আঁকড়ে ধরতে হবে। আসলে যা চূড়ান্ত স্থায়িত্ব পাবে, সেই ব্যবস্থা গুলো যদি যথাযথ ভাবে কার্যকারিতা পায়, তাহলেই আমাদের এই বিধান বা ধর্মের কার্য্যাবলী পালনের স্বার্থকতার প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠবে। জগৎ সংসার এবং সবার কল্যাণময় জীবন কামনা করে এখানেই শেষ করছি।

সৃষ্টির সূচনা সম্পর্কে আলোচনা

বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম।
অর্থঃ- আল্লাহ্‌র নামে শুরু আর-রহ্‌মান (যিনি দয়াল দাতা) এবং আর-রহিম (যিনি দয়ালু)।

খালাকাল্লাহু আদামা আলা সুরাতিহি।
অর্থঃ- আদমকে আমি আমার (আল্লাহ্‌র) নিজ সুরতে তৈরী করেছি।
(আল-হাদিস)

আমরা যারা মানবকূলে জন্ম নিয়েছি, সবাই আদম সন্তান হিসাবেই জেনে থাকি। কিন্তু মানুষের সংজ্ঞায় কোরান অর্থ করেছে ইনসান। কালামপাকে কোথাও বলা নেই যেঃ- খালাকাল্লাহু ইনসান আলা সুরাতিহি। অর্থাৎ মানুষকে আমি আমার সুরতে তৈরী করেছি, এমনটা কিন্তু বলা নেই।

এখানে বলা হয়েছেঃ- খালাকাল্লাহু আদামা আলা সুরাতিহি। অর্থঃ- আদমকে আমি আমার (আল্লাহ্‌র) নিজ সুরতে তৈরী করেছি। অর্থাৎ আদমকে আল্লাহ্‌র নিজ সুরতে তৈরী করার কথা বলেছেন। তাহলে এটা একটি রহস্যময় এবং গভীর তাৎপর্য্যপূর্ণ চিন্তার বিষয়। সে বিষয়ে আমরা একটু ভাববাদি ব্যবস্থায় বুঝতে চেষ্টা করব।

সেটা হলোঃ- আদম অর্থ মানুষ এবং ইনসান অর্থও মানুষ বলা হয়। কিন্তু এই দুই মানুষের মধ্যে একটি সুক্ষ্ম তফাৎ রয়েছ, সেই তফাৎ বা ব্যবধানটাই কালামপাকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে যেঃ- খালাকাল্লাহু আদামা আলা সুরাতিহি। অর্থঃ- আদমকে আমি আমার (আল্লাহ্‌র) নিজ সুরতে তৈরী করেছি। অর্থাৎ এখানে আল্লাহ্‌পাক আদম বলেছেন, ইনসান বা মানুষ বলেন নি এবং সুরত বলতে আমরা আল্লাহ্‌র চেহারা বা অবয়বকে বোঝানো বা মেলে ধরা হয়েছে। তাহলে আল্লাহ্‌পাকের নিজ চেহারা বা অবয়বে আদমকে তৈরী করেছেন। এই তৈরীর ধারা থেকে বিবর্তনবাদ হতে হতে আমরা ইনসান বা মানুষে রুপান্তর হয়েছি। তাহলে প্রশ্ন হলো আমরা মানুষ কতটুকু ? বিভাজনকৃত প্রকিয়া থেকে শুরু করে একত্রিত করণ সম্পাদন প্রকিয়ায় সমাসীন হলেই তবেই প্রকৃত মানুষ বা আদম হয়। তাছাড়া আমরা সবাই ইনসান বা রুপান্তরিত মানুষ, আদম নই। তাহলে এই সম্পাদন বা প্রকৃত মানুষ কি ভাবে হয় ?

আমরা জেনেছি মানুষের মধ্যে তিনটি সত্ত্বা বিরাজিত। সেগুলো হলোঃ- আল্লাহ্‌ সত্ত্বা বা রুহ, শয়তান বা মন্দ সত্ত্বা এবং নফ্‌স বা আমিত্ত সত্ত্বা। এই তিনটি সত্ত্বা যদি একটি দেহতে বিরাজিত হয় তাহলেই তিনি মানুষ। সৃষ্টি রাজ্যে যত মাখলুক রয়েছে মানুষ ব্যতিত এই তিনটি সত্ত্বা একত্রে অন্য কাউকে দেওয়া হয় নি। তাহলে এটা হলো প্রাথমিক ভাবে মানুষেকে চিহ্নিত বা চিত্রায়িত করণ একটি ব্যবস্থা। আমরা অনেকেই শুনে থাকি যেঃ- হুস আছে যার তিনি মানুষ, যার হুস নেই তিনি বেহুস অর্থাৎ মানুষের মত দেখতে হলেও প্রকৃত মানুষ নয়। তাই মানব রুপে জন্ম নিলেই সে মানুষ হয় না। মানুষ হতে হলে নিজের মধ্যে মানবিক গুণাবলির বিকাশ ঘটাতে হয়, এই বিকাশ ঘটলে তবেই সে মানুষ হয়। অর্থাৎ শ্রেণীর বৈষম্যের একটি ধারা।

পৃথিবীর বর্তমান জনসংখ্যা ৭৫০ কোটিরও অধিক। এই সকল মানুষের বিধান বা ধর্মীয় যে কাঠামো সেই কাঠামোটা আমাদের সবার এক নেই। মানুষ যার যার ধর্মের অবলম্বনে মনুষ্যত্ত্বের বিকাশ ঘটানোর চেষ্টা করে এবং এই মনুষ্যত্ত্বের বিকাশের মাধ্যমে তারা স্রষ্টাকে খুঁজে থাকে। কেউ মুসলিম, কেউ হিন্দু, কেউ বৌদ্ধ, কেউ খ্রিস্টান এভাবে ২৫০টির অধিক ধর্ম রয়েছে। কিন্তু প্রতিটি ধর্মের মূল যে ধারাবাহিক প্রণালী সেটা একই ধারাতে রয়েছে। অর্থাৎ তারা স্রষ্টাকে খুঁজে থাকে সেই ধারা এক। অর্থাৎ স্রষ্টা কর্তৃক ব্যবস্থা দ্বারাই এই ধর্ম পরিচালিত হয় এবং ধর্মের অবলম্বনের মাধ্যমে স্রষ্টার প্রেরণকৃত ব্যবস্থায় সফলতা লাভ করতে হয়। এজন্য প্রত্যেক মানুষের জন্য ধর্ম এসেছে। ধর্মের জন্য মানুষ আসেনি। তাই মানুষের জন্য যদি ধর্ম এসে থাকে তাহলে সেই ধর্মের আমল নীতি গুলো নিজের জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা এগুলো দিয়ে আমাদের ভাবতে হবে। যদি কেউ প্রকৃত বিধান সম্পর্কে জানতে চায় তাহলে তাকে প্রাথমিক ভাবে তিনটি বিষয়ে চিন্তা করতে হবে। প্রথম চিন্তা হলো:- আমি কোথায় ছিলাম ? কোথায় আমাকে সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছিল! দ্বিতীয় চিন্তা হলো:- আমি কেন এখানে আসলাম ? কি উদ্দেশ্যে আমাকে এখানে পাঠানো হলো ? অর্থাৎ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে সময়টা আমাকে দেওয়া হয়েছে, এই সময়ের পর আমি কিন্তু আর এখানে থাকবো না। তাহলে এই সময়টা কিসের জন্য আমাকে দেওয়া হলো ? আমাকে যেহেতু ফিরে যেতে হবে, তবে এভাবে কেন দেওয় হলো ? তৃতীয় হলো:- এখান থেকে আমাকে বিদায় নিতে হবে, তাহলে এই বিদায় নিয়ে আমি কোথায় যাবো ? এই তিনটি বিষয় নিয়ে একান্ত ভাবে নিজের মনোরাজ্যে চিন্তা করবেন। তাহলে আপনি একটা সঠিক রাস্তা পেয়ে যেতে পারেন। সত্যের ধারক এবং বাহকের ব্যবস্থা কিঞ্চিত হলেও একজন মানুষের হৃদয়ের মধ্যে জাগরিত হবে। এই প্রক্রিয়াতে মানুষ মন্দকে ছেড়ে ভালোর দিকে অগ্রসর হয়। ভালোর দিকে অগ্রসর হলে এক সময় বণী আদম থেকে প্রকৃত আদমে রুপান্তর হলেই পূর্ণতা জারী হবে ।

সক্রেটিস বলেছেন:- জীবন তখনই স্বার্থক! যখন তুমি জানবে যে তুমি কি করছো, কেন করছো, কি উদ্দেশ্যে করছো। জ্ঞানহীন, কর্মহীন, উদ্দেশ্যহীন জীবন কেবল গবাদি পশুর জন্য, মানুষের জন্য নয়। কারণ মানুষ ইচ্ছা করলেই সে নিজে নিজে পৃথিবীতে আসতে পারে না। তাহলে আমরা কোথাও না কোথাও সংরক্ষনকৃত ব্যবস্থার মধ্যে ছিলাম। সেখান থেকে আমাদের এখানে প্রেরণ করা হয়েছে। এই প্রেরণের সাথে একটা নির্দিষ্ট সময় যোগ করে দেওয়া হয়েছে এবং এই সময়টা আমাদের জন্য পরীক্ষা স্বরুপ রাখা হয়েছে।

এটা একটি রহস্যময় ব্যবস্থা। কারণ এই দুনিয়াতে আসবার পরে আমরা মোহ মায়ার জালে আঁটকে পড়লাম না কি স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভের জন্য নিজেকে নিয়োজিত করলাম! আমাকে পরীক্ষা স্বরুপ দুনিয়াতে প্রেরণ করা হয়েছে। এই পরীক্ষায় যিনি সফল হবেন তার জন্য রয়েছে উত্তম পুরষ্কার, আর যিনি বিফল হবেন তার জন্য রয়েছে শাস্তি। আমাকে যেহেতু মৃত্যুর স্বাদ গ্রহন করতে হবে, তাহলে আমি যেখান থেকে এসেছি, সেখানে আমার প্রত্যাবর্তন করতে হবে। অর্থাৎ স্রষ্টার কাছ থেকে যদি আমাদের আগমন হয় তাহলে স্রষ্টার কাছেই আবার ফিরে যেতে হবে। এই প্রক্রিয়াগত ব্যবস্থার মধ্যে আমরা ধর্ম পেয়েছি।

আমি মুসলমান অধ্যাসিত একটি পরিবারে জন্ম লাভ করেছি, ছোট বেলা থেকেই বাবা-মায়ের শিখানোকৃত ধর্ম জন্ম সূত্রে পেয়েছি। সেখান থেকেই আমার ধর্মীয় অনুসরণ অনুকরণের পালন তব্য যে সকল বিষয় রয়েছে, সেটা জন্ম লাভের পর থেকেই প্রচলিত ধারাতে পেয়েছি। মনের মাঝে প্রশ্ন উকি দিয়ে যায় যে, আমি যদি অন্য কোন ধর্মের অনুসারীর পরিবারে আমার জন্ম হত, আমি হয়ত তাদের ধর্ম পালন করতাম ? তাই আমাদের সবার উচিৎ ধর্মীয় জীবনের সত্য লাভ করতে হলে ধর্মীয় আঙ্গিকগুলো নিজস্ব জ্ঞান, বুদ্ধি, মেধা, প্রজ্ঞা এগুলোকে জাস্টিফাই করে ধর্মের মূল উপাদেয় বিষয়গুলো পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ধর্মের পূর্ণতার দিকে ধাবিত হওয়া। কারণ পৃথিবীতে যত মানুষই থাকুক, পরকালীন জিন্দিগিতে কেউ কারো নয়। অর্থাৎ যার যার হিসাব তাকেই দিতে হবে। সেখানে কেউ কারো হিসাব দিবে না। তাই সবাইকে সেই হিসাব দেবার জন্য তৈরী হতে হবে।

সেই তৈরীকৃত ব্যবস্থার জন্য সর্বপ্রথম একজন মানুষকে প্রকৃত মানুষ হতে হবে। আমি যেহেতু প্রকৃত মানুষ না, তাই যিনি প্রকৃত আদম বা মানুষ হয়েছেন তাঁর কাছেই প্রকৃত মানুষ হবার কার্যাবলী শিখতে হবে। এটাই প্রকৃত মানুষ হবার সিস্টেম বা পদ্ধতি। নবী-রাসুল, ওলিগণ এই নির্দেশনামা দিয়ে গিয়েছেন যে, তোমাকে একজন প্রকৃত মানুষের (আদম, পীর বা মোর্শেদ) কাছে বায়াত বা আত্মসমর্পন করতে হবে। এজন্য সুফিগণ বলে থাকেন, ইনসানে কামেল হলো আদম।

কারণ বেলায়েতের পূর্বে নবূয়্যতির যে ব্যবস্থা ছিল সেটা হলো:- নবীগণ দুনিয়াতে আসবার পর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ওহী মারফত যে সকল নির্দেশনামা মানুষের জন্য পেয়েছেন, সেটা তাঁর উম্মত বা জনগোষ্ঠীর মাঝে প্রচার

করেছেন। এই প্রচারের মধ্য দিয়ে তাঁরা ধর্মকে একটি পরিপূর্ণতায় দাঁড় করিয়েছেন। স্রষ্টার পক্ষ থেকে খাতামান নবূয়্যত হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নবী প্রেরিত হবার ব্যবস্থা খতম বা শেষ করা হয়েছে কিন্তু কোরানুল মাজিদের কোথাও খাতামান রাসুল এই কথাটা আসেনি। আল্লাহ্‌পাক কালামপাকে বলেছেন যে প্রত্যেক জাতির জন্য আমি নির্ধারিত রাসুল প্রেরণ করেছি। তাহলে খাতামান রাসুল যদি কোরানুল মাজিদে না এসে থাকে তাহলে রাসুল কনোস্টেন্ট নীতিতে অবারিত ভাবে চলমান রয়েছেন। তাহলে জাতি বা গোষ্ঠীর মধ্য থেকে আপনার রাসুলকে নির্বাচন করতে হবে। সেই নির্বাচিত রাসুলের কাছ থেকে আপনাকে শিক্ষা গ্রহন করতে হবে।

আমি আরও একটু খোলাসা ভাবে মেলে ধরতে চাই সেটা সাধক বাউল লালন শাঁইজি তাঁর গানের ভাষায় বলেছেন যে:- যিনি মোর্শেদ তিঁনিই রাসুল, ইহাতে নাই কোন ভূল, খোদাও সে হয়। অর্থাৎ একটি সিঁড়ী ধরে তাঁর (আল্লাহ্‌র) মূল চূড়ায় অবস্থান করবার যে সিস্টেম্যাটিক্যাল প্রণালীর শিক্ষা, সেই শিক্ষাটাই গুরুবাদ বা আহলে বায়াতের শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যম দিয়েই কার্যকারিতা পায়। তাই কোরানুল মাজিদে আল্লাহ্‌পাক বলেছেন:- ইয়া আইয়্যু হাল্লাজিনা আমানু। অর্থ:- ওহে তোমরা যারা ঈমান আনায়ন করিয়াছো। অপর একটি আয়াতে এভাবে বলা রয়েছে যে:- ইয়া আইয়্যু হাল্লাজিনা আমানু, কুতুবে আলাইকুম সিয়ামু, কুতুবে আলাইকুম লিআল্লাকুম তাত্তাকুম। অর্থ:- ওহে তোমরা যারা ঈমান আনায়ন করিয়াছো, তোমাদের জন্য রোজাকে ফরজ করা হইয়াছে, যেমন করা হইয়াছিল পূর্ববর্তী গণদের উপর। অর্থাৎ ঈমান আনবার পরে এই সকল আমল নীতির আহ্বান করা হয়েছে, যাহা পালন করতে হবে।

এজন্য পীর বা মোর্শেদের কাছে বায়াত বা মুরিদ হওয়াই হলো আল্লাহ্‌র প্রতি প্রাথমিক ভাবে ঈমান আনায়ন করা। কারণ আল্লাহ্‌পাক বলেছেন, তুমি তাঁকে অনুসরণ কর যিনি হেদায়েত পাইয়াছে। যদি ঈমানই আনায়ন না করা হয়, তাহলে আপনার আমল গুলোর কার্যকারিতা কী করে ঘটবে ? মানুষের মধ্যে নফ্‌স সত্ত্বা রয়েছে। এই নফ্‌সকে বলা হয় আমি। এই নফ্‌সই সুখ-দুঃখ যন্ত্রণা অর্থাৎ সকল কিছুর ভোগ এই নফ্‌স করে থাকে। কিন্তু ভোগে মুক্তি নেই, মুক্তিতে ভোগ নেই। সুখ-দুঃখ দুটোই ভোগ। এতকিছু ভোগ করবার পরেও নফ্‌সকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহন করতে হবে। এই নফ্‌সেরই শাস্তি হয়। কোরানুল মাজিদে তিন প্রকার নফ্‌সের কথা বলা হয়েছে। প্রথম হলো:- নফ্‌সে আম্মারা। দ্বিতীয় হলো:- নফ্‌সে লাউওয়ামা। তৃতীয় হলো:-নফ্‌সে মোতমায়েন্না।

সেই সত্ত্বা – ১০০

আম্মারা নফ্স হলো:- এটা শয়তানি বা মন্দ সত্ত্বার দখলকৃত অবস্থা। অর্থাৎ আল্লাহ্ প্রদত্ত ব্যবস্থায় একটি মানুষ যে দেহ খাঁচার আবরণকৃত কাঠোমোতে পরিচালিত হচ্ছে সেই ব্যবস্থাটাই হলো নফ্সে আম্মারা। এই নফ্সে আম্মারা থেকে যখন একটি মানুষ নফ্সে লাউওয়ামার দিকে অগ্রসর হয় তখনই তার একটি গাইডেন্স প্রয়োজন হবে। অর্থাৎ এই গাডেন্সটাই হলো একজন রাসুলের কাছে শিক্ষা গ্রহন করতে হবে। যেহেতু আমরা বর্তমান বেলায়েতকৃত ব্যবস্থায় গুরুবাদী ব্যবস্থার মধ্যে বা সুফিমতে পরিচালিত তাই আমরা পীর বা মোর্শেদ প্রদত্ত ব্যবস্থাকেই এভাবে জানি। নফ্সে আম্মারা স্বাভাবিক ভাবে দুনিয়াতে কোন কিছুর সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত না করে ধর্মের উপর পরিচালিত হওয়াই হলো নফ্সে আম্মারা কার্যাবলি। এজন্য ওলিগণ বলে গেছেন:- লা শাঁইখ ইল্লা ইবলিশ। অর্থ:- যার পীর নেই তার পীর শয়তান। অর্থাৎ নফ্সে আম্মারাকে বলা হয় শয়তানি নফ্স। তাই শয়তানি নফ্স থেকে যদি একজন মানুষ আল্লাহ্মুখী হতে চায়, তাহলে তার প্রথম শর্ত হলো একজন পীরের নিকট বায়াত বা মুরিদ হওয়া। মুরিদ বা বায়াত গ্রহন করার কার্যটুকু যিনি সম্পাদন করবেন তখনই সে নফ্সে আম্মারা থেকে নফ্সে লাউওয়ামার দিকে পরিগমন করবেন।

আল্লাহ্পাক কোরানুল মাজিদে এই লাউওয়ামা নফ্সের কসম খাচ্ছেন। লাউওয়ামা নফ্সকে বলা হয় জিহাদরত বা যুদ্ধরত নফ্স। তাহলে এই জিহাদটা কোথায় হয় ? এটা কোন মাঠে ময়দানের যুদ্ধ বা জিহাদ নয়, এটা আপন দেহ ভূবনের যুদ্ধ বা জিহাদ। তাই মিছে ধর্ম যুদ্ধ না করে নিজের ভিতরের খান্নাসরুপী শয়তানের সাথে যুদ্ধ করে ভিতরের মন্দ সত্ত্বাকে হত্যা করতে হবে। নিজের সঙ্গে নিজেকে যুদ্ধ করে জয়লাভ করবার যে সাধন প্রক্রিয়া সেটাই নফ্সে লাউওয়ামা করে থাকে। নফ্সে লাউওয়ামার পথ হলো সুদূর প্রসারি। অর্থাৎ একটি মানুষের স্বাভাবিক জ্ঞান ক্ষমতা হবার পর থেকে বছরের পর বছর, দীর্ঘ্য সময় অনেককেই এই যুদ্ধ বা জিহাদ চালিয়ে যেতে হয়। ইহা যেন শেষ হতে চায় না। অর্থাৎ প্রশান্তি মহাসাগর সাঁতরিয়ে পাড়ি দেবার মত। সেখান থেকে পরিপূর্ণতার সোপানে পৌঁছালে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তখন আহ্বানের সারা পাওয়া যায়। তাহলে এই নফ্সে লাউওয়ামার সাথে জিহাদ বা যুদ্ধের সূচনা করতে হলে পীরের নির্দেশিত পথে ট্রেনিংগুলো বা পীরের দেওয়া আমল নীতি গুলো কার্যকারিতা করেই সে যুদ্ধে জয়লাভ করে পূর্ণতার অবগহনে পৌঁছাতে হবে।

তাই ঈমান আনায়নের জন্য সুফিমতের ধারাতে যে বিস্তারিত ব্যাখ্যা, সেটা এসেছে আমানুর সংজ্ঞায়। অর্থাৎ একজন মানুষ যখন পীর বা মোর্শেদের কাছে বায়াত বা মুরিদ হয়, তখনই সে আমানু হিসাবে পরিগণিত হয়। বায়াত বা মুরিদ হবার পর তাকে মোরাকাবা মোশাহেদার আমল নীতিতে দাঁড় করানো হয়। সেই আমল বা কর্মের সাধনা যিনি করেন এই কর্মটাই হলো নফ্সের সাথে জিহাদ বা যুদ্ধ। এই যুদ্ধরত অবস্থা থেকে যখন একজন মানুষ সফলতায় পৌঁছায়। তখনই তৃতীয় স্তরে থাকে সফলতার আহ্বান। যেটা কোরানুল মাজিদে আল্লাহ্পাক বর্ণনা করেছেন যেঃ- ইয়া আইয়্যুহান নাফ্সিন মোতমায়েন্না ইরজিইলা রব্বিকা, রদিায়া তাম্মারদিয়া, ফাদখুলি ফি ইবাদি, ওয়াদিখুলি জান্নাতি। অর্থঃ- ওহে পরিতুষ্ট আত্মা, তুমি সন্তুষ্টি ভাজন হইয়া আসো, অতঃপর তুমি আমার দ্বাসদের মধ্যে দাখিল হও, অতঃপর আমার জান্নাতে প্রবেশ কর। তাহলে এখানে আমরা জাগতিক ভাবে মৃত্যুর পর যে সকল বিধি বিধান শুনে থাকি, এই আয়াতে কারিমায় কিন্তু এগুলোর কোন চিহ্ন বা লেস রাখা নেই। এই আয়াতে জীবিত একজন মানুষও যদি মোতমায়েন্নাতে পরিগমন করে পূর্ণতা লাভ হয়, তখনই আল্লাহ্পাক তাঁকে আহ্বান করবেন। সেই মানুষটা তখন এই আয়াতে কালামের স্বার্থকতা উপলব্ধি করতে পারবেন। অর্থাৎ নগদের যে প্রক্রিয়া সেই প্রক্রিয়াতে এটা বাস্তবায়ন হবে।

এটা যদি প্রকাশিত ভাবে বলা হয় তাহলে জাগতিক যে ধর্মীয় বিধি-বিধান রয়েছে সেটার সৌন্দর্য্য আর থাকে না। তাই জাগতিক বিধি বিধান সুন্দর রাখতেই এই গুপ্ত ব্যবস্থার মাধ্যম রাখা রয়েছে। অর্থাৎ যেটা প্রকাশিত সেটা তো প্রকাশ হয়েই আছে কিন্তু গুপ্ত ব্যবস্থাকে যিনি খোঁজ করবেন, তিনি এই গুপ্ত ব্যবস্থার সন্ধান পেয়ে থাকেন। যিনি খোঁজ করবে না তিনি পাবে না। এজন্য এই প্রক্রিয়াতে যেতে হলে কোরানুল মাজিদের আয়াতে কারিমার বাস্তবায়নের রুপ দাঁড় করতে হবে। এই বাস্তবায়নের রুপ দাঁড় করবার জন্যই সাধনা করতে হবে। সেই সাধনার শিক্ষা গুরুবাদী ব্যবস্থায় পীর বা মোর্শেদ দিয়ে থাকে। যিনি এই প্রক্রিয়ায় পরিচালিত হন, তার কার্যক্রম স্বাভাবিক চলমান রীতিনীতি থেকে একটু ভিন্নতর হয়ে থাকে। ব্যতিক্রম দৃষ্টিভঙ্গি তার মধ্যে দেখা যায়। কারণ সে ফকিরি বা দরবেশের দিকে এগিয়ে যায়। এজন্য হযরত বু-আলী কলন্দর (রহঃ) বলেছেনঃ- যে ব্যক্তি ফকির দরবেশ হয়ে গেছে তার জন্য সুখবর যে, তিঁনি শরিয়তের প্রকাশ্য বিধি-বিধান থেকে মুক্ত। তাঁর জন্য শরিয়তের জ্ঞান তাঁলাশ করার দরকার নেই।

সুফিমত নিতান্তই একটি ব্যতিক্রম ধারা মত। কেন ? কারণ ধর্মের যে মূল কাঠামো সেটা স্বাভাবিক প্রণালীতে আসেনি। স্রষ্টার নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ কোন প্রাতিষ্ঠানিক স্কুল, কলেজের শিক্ষায় শিক্ষিত হন নি, ইতিহাস সাক্ষ্য। আধ্যাত্মিক সাধনার দ্বারাই ধর্মের পবর্তকগণ এসে ধর্মের শিক্ষাগুলো দিয়েছেন। তাঁরা মায়ের গর্ভ থেকে জন্ম লাভের পর শিশুকাল থেকে তিল তিল করে বড় হয়ে ধর্মের পরিপূর্ণতা লাভ করবার পরেই তিঁনি ধর্মের শিক্ষাগুলো মানুষকে দিয়েছেন। তাহলে এই পরিপূর্ণতায় শিক্ষা লাভ তাঁরা কিভাবে করে ? তাই এই শিক্ষা লাভ করতে হয় আধ্যাত্মিক ব্যবস্থা প্রণালীর মাধ্যমে। আধ্যাত্মিক প্রণালীর শিক্ষাটা রাসুলে পাকও (সঃ) দেখিয়ে গেলেন জাবানুল নূর পর্বতে বা হেরা গুহায়। আপনাদের পূর্বেই পরিজ্ঞাত করেছি যেঃ- রাসুল (সঃ) ২৫ বছর বয়স থেকে নবূয়্যত প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত, সময় অসময়ে ১৫ বছর ১মাস ১৯ দিন হেরা পর্বতে এই শিক্ষার অনুশীলন দেখিয়ে গেছেন। আর এভাবেই নিজের আত্মার জাগরণ হয়। তাই জাগরণকৃত ব্যবস্থার মাধ্যম দিয়ে ধর্মের পরিপূর্ণতা লাভ হয়। এই পূর্ণতা লাভ করবার পরে স্রষ্টা যদি তাঁকে ধমের্র প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন, তাহলেই তিঁনি ধর্মের প্রবর্তক হন। যুগে-যুগে, কালে-কালে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার মতান্তরে দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার, তাঁরা সবাই দুনিয়াতে এই আধ্যাত্মিকতার বলয়ে শিক্ষা লাভ করেছেন। আজকে বর্তমান যুগে সেই শিক্ষাটা আমাদের সমাজের ধর্মীয় কারিকুলাম থেকেই ডাইভার্ড বা সরিয়ে ফেলা হয়েছে। এই শিক্ষার কথাটা মানুষকে আর জানান দেওয়া হয় না। যারা ধর্মকে ব্যবহার করে নিজেদের আঁখেড় গোছাতে চায় তারাই এটা বিলুপ্ত করছে।

তাই যারা প্রকৃত ধর্মের শিক্ষা পরিচালনা করেন, তাঁরা এই অনুশীলনগামী মোরাকাবা মোশাহেদা বা ধ্যান সাধনার শিক্ষা গুলোই দিবেন। সকল ধর্মের প্রবর্তক এভাবে আধ্যাত্মিক প্রণালীতে শিক্ষা লাভ করে, ধর্মের প্রবর্তক হয়েছেন। একটি প্রবাদ আমরা শুনে থাকি যেঃ- দশচক্রে ভগবান ভূত হয়। অর্থাৎ যিনি এই সমস্ত মূল আমল নীতির কথা বলেন, তাকে সবাই মিলে ঝাঁপটে ধরা হয় বা জোড় করে তাদের মিথ্যার আশ্রিত ব্যবস্থার মান্যতা স্বীকার করানোর প্রচেষ্টা করা হয়। কিন্তু আল্লাহ্‌র হাবিব বলেছেন যেঃ- আমার পরবর্তী ব্যবস্থায় নায়েবে রাসুল ধর্ম শিক্ষা দেবেন। এই ধর্মীয় বিধানের তাৎপর্য্য হলো যুগে-যুগে যত নবী-রাসুলগণ এসেছেন, তাঁদের সাথে ভার্সেস বা সমন্বয় করলে দেখা যায় প্রত্যেকের বিধান একই রুপে ছিল। এই বিধান আলাদা নেই। তাহলে যারা ধর্মকে ব্যবসায়িক প্রণালীতে দাঁড় করিয়েছে, তারাই অপকৌশলের

মাধ্যমে রাসুলের (সঃ) মোরাকাবা মোশাহেদা বা ধ্যান সাধনাকে ডাইভার্ড করে দিয়েছে। যিনি মানুষের কল্যাণ বা মুক্তির ধর্ম দিয়েছেন তিঁনিই ধর্মের হেফাজতকারী। তাই তিঁনিই এই ধর্মকে মানুষের দোরগোঁড়ায় পৌঁছে দিচ্ছেন ওলিদের মাধ্যমে। আল্লাহ্পাক মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি দিয়েই দুনিয়াতে প্রেরণ করেছন। স্রষ্টার ধর্মকে গ্রহন বা বর্জন করা বান্দার ইচ্ছা। সেই স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে। যে যা করবে আল্লাহ্পাক বিচারিক ব্যবস্থা দ্বারা তাকে সে অনুযায়ী ফলদান করবেন। ভাল করলে পুরষ্কিত হবে, আর মন্দ করলে শাস্তি পাবে। এখানে কোন ছাড় নেই। কারণ আল্লাহ্পাক বলেছেনঃ- কারো প্রতি এক জার্‌রা পরিমাণ পারসিয়ালটি করবেন না।

তাই সুফিমতের আলোকে, এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষ পরিপূর্ণতা বা সফলতা লাভ করতে পারলেই সে বুঝতে পারে। তখনই এই কালামপাকের বাস্তবায়ন সম্পর্কে উপলব্দি করতে পারবেন। আয়াতটি হলোঃ- ইয়া আইয়্যুহান নাফ্সিন মোতমায়েন্না ইরজিইলা রব্বিকা, রদিয়া তাম্মারদিয়া, ফাদখুলি ফি ইবাদি, ওয়াদিখুলি জান্নাতি। অর্থঃ- ওহে পরিতুষ্ট আত্মা, তুমি সন্তুষ্টি ভাজন হইয়া আসো, অতঃপর তুমি আমার দাসদের মধ্যে দাখিল হও, অতঃপর আমার জান্নাতে প্রবেশ কর। এই আয়াতের প্রতিফলন হলো ঐ নফ্স তিনটির স্তর। যদিও ওলিগণ আরো দুইটি নফ্সের নাম বলে থাকে। একটা হলো নফ্সে মূল হেমার এবং অপরটি নফ্সে রহ্মানিয়া। তাহলে এগুলো ওলিদের বিশেষ বিভাজনকৃত ব্যবস্থা। পবিত্র কলেমাকে সৃজনশীল পৃথকীকরণ করতে আরও দুইটি ভাগকে ওলিরা সৃজন করে দাঁড় করিয়ে দেখিয়েছেন। অর্থাৎ পাক পাঞ্জাতনের সঙ্গে সংযুক্ত রাখতে এই ভাগ গুলো সমন্বয় করে থাকে। এই নফ্স যখন মোতমায়েন্নাতে পরিগমন করে পরিপূর্ণতা লাভ করবে তখনই একটি মানুষ এই প্রকৃত মানুষ হবে।

আর প্রকৃত মানুষ হবার পরেই ইনসানে কামেলের রুপ হলো আদম। স্বাভাবিক ভাবে যারা মানুষ তারা আদম নয়। আমরা হলাম বণী আদম। তাই এই স্তরে পরিপূর্ণতায় যিনি দাখিল হন, তিঁনিই আদমে পরিগণিত হন। তাঁকেই আল্লাহ্পাক বলেছেন যেঃ- খালাকাল্লাহু আদামা আলা সুরাতিহি। অর্থঃ- আদমকে আমি আমার নিজ (আল্লাহর) সুরতে তৈরী করেছি। অর্থাৎ তাঁর সুরতটাই আল্লাহ্পাকের সুরত হয়ে যায়। আরেকটু আপনাদের বুঝবার জন্য বলি, সেটা হলোঃ- আল্লাহ্র সাথে রাসুলের (সঃ) মেরাজ পরবর্তী ঘটনায় সাহাবাগণ রাসুল (সঃ) জিজ্ঞেস করলেন যে,

ইয়া রাসুলআল্লাহ্ আল্লাহ্কে দেখতে কেমন ? তখন রাসুল (সঃ) বললেন তোমার মত। এভাবে চারজন সাহাবাকে আল্লাহ্র হাবিব বললেন, তোমার মত। এই চারজন সাহাবা যখন ফিরে গেল তখন কিছু সাহাবা বসে ছিলেন। তখন তারা জিজ্ঞেস করলেন যে, ইয়া রাসুলআল্লাহ্ আপনি তাদের সবাইকে বললেন আল্লাহ্ দেখতে তোমার মত। তাহলে তারা সবাইতো এক রকম না। এটার ভেদ রহস্যটা কী ? তখন আল্লাহ্র হাবিব বললেন আল্লাহ্কে দেখতে তোমাদের মত। এর অর্থ হলো একজন মানুষ যখন ইনসানে কামেল হয়ে যাবেন তখন তার দৃষ্টিতে ভিন্নতার চেহারা আর পড়ে না। যার দলিল কোরানুল মাজিদে আল্লাহ্পাক এভাবে দিয়েছেন যে:- রব্বুল মাশরেখে ওয়াল মাগরেব লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু হাত্তাখিজু ওয়াকিলা। অর্থ পূর্ব পশ্চিম যে দিকেই তাঁকাও আমি আল্লাহ্ ব্যতিত কিছুই দেখতে পাবে না, উছিলার অন্বেষণ কর। এই কালামপাকেও আল্লাহ্পাক উছিলা ধরবার কথা বলে দিয়েছেন। তাহলে যে দিকে তাঁকাবো সেদিকেই আল্লাহ্কে দেখতে পাবো। আমরা যে দিকে তাঁকায় শুধু দেখি তৌহিদ রাজ্যে যা কিছু দন্ডায়মান রয়েছে সেগুলোকে। কিন্তু আল্লাহ্কে দেখিনা। তাই আল্লাহ্কে দেখতে হলে এই আয়াতে কারিমাকে দেহ রাজ্যে বাস্তবায়ন করতে হবে। এজন্য ইনসানে কামেলই হলো আদমের রুপ। তখনই এই আয়াতের কার্যাকারিতা বাস্তবায়ন রুপে দাঁড়ায়। অর্থাৎ তিঁনি এবং আল্লাহ্ একই। এখানে কোন ভিন্নতা থাকে না।

ধর্মীয় পটভূমিতে দর্শন রয়েছে, সুফিমতের আলোচনায় এভাবে আসছে। কিন্তু যারা বলে আল্লাহ্কে দেখা যায় না তাহলে তারা কোন ধর্মের পটভূমি নিয়ে চালিত হচ্ছে ? তাদের দর্শনটা কেমন ? তাদের হলো পুস্তগত বা মুখস্ত বিদ্যার জ্ঞান। এজন্য আল্লাহ্পাক কোন প্রতিনিধিকে পুঠিতব্য জ্ঞান দ্বারা শিক্ষা দিয়ে পাঠায় নি। তাই আল্লাহ্র যত প্রতিনিধি দুনিয়াতে এসেছেন সবাই এই ঐশি বা আধ্যাত্মিক প্রণালীতে পূর্ণতা অর্জনের মাধ্যম দিয়ে বা দর্শনের মাধ্যম দিয়ে তাঁরা ধর্মকে প্রচার করেছেন। এজন্য আধ্যাত্মিকতা একটি রহস্যময় বিষয়। কারণ পবিত্র কালামপাকে যে সকল আয়াতে কারিমাগুলো রয়েছে এগুলোর বাস্তবায়ন করা হলো ওলিদের কার্যবলী। তাই কোরানের আয়াতে কারিমাকে মানুষের জীবনে বাস্তবায়ন করে প্রকৃত মানুষ হতে হবে। যিনি প্রকৃত মানুষ তাঁকে বলা হয় ইনসানে কামেল। ইনসানে কামেল হলো আদম। আদমকে (আঃ) তৈরী করা আল্লাহ্র সুরত থেকে।

তাহলে আমরা রুপান্তর বাদে বনী আদমে এভাবে পৃথিবীতে এসেছি। পৃথিবীতে আমাদের আগমন ঘটেছে শয়তানের ধোঁকায় পড়ে (একটা নাটকীয়তার মধ্যে)। আল্লাহ্‌র হুকুম ছিল আদম (আঃ) কে সেজ্‌দা দিতে, এই সেজ্‌দা না দেবার কারণেই সে আযাজিল থেকে শয়তানের ভূষিত হয়। কারণ শয়তান আল্লাহ্‌ ব্যতিত সে অন্য কাউকে মানে না, সরাসরি আল্লাহ্‌কে ডেকে লাভ করতে চায়। ইবলিশ আদম বা গুরু মানে না, এজন্য সে আদম (আঃ) কে সেজদা দেয় না। আমাদের সমাজের বেশির ভাগ মানুষই সরাসরি আল্লাহ্‌কে লাভ করতে চায়, তারাও উছিলা মানে না। এজন্য ওলিদের দর্শনে বলা রয়েছেঃ- লা শাঁইখ ইল্লাহ্‌ ইবলিশ। অর্থঃ- যার পীর নাই তার পীর শয়তান। তাই যারা শয়তানের আশ্রিত ব্যবস্থার মধ্যে থেকে যে যাই কিছু করছেন, তাদের ফলাফলটা তেমনই হবে।

আপনাদের আগেই পরিজ্ঞাত করেছি যে, শয়তান বা মন্দ সত্ত্বা এই দেহের মধ্যেই থাকে। শয়তান, ইবলিশ, মরদুদ খান্নাস এই চারটি নামের বিশেষণে পবিত্র কালামাপাকে আল্লাহ্‌ পৃথক পৃথক আয়াত নাজিল করেছেন। (১) আউযুবিল্লাহি মিনাস শয়তানির রাজিম। অর্থ বিতাড়িত বিদ্রোহ শয়তান হতে থেকে আশ্রয় প্রার্থণা করছি। (২) ফাসাজাদু ইল্লা ইবলিশ। অর্থঃ- সবাই সেজ্‌দা দিল একমাত্র অহংকারী সেজ্‌দা দিল না। অর্থাৎ ইবলিশ সেজ্‌দা দেয় না। (৩) আত্তালেবুদ্দুনিয়া মরদুদ। অর্থঃ- যে কেবল দুনিয়া চাইল বলে দাও সে মরদুদ নামে শয়তান। (৪) মিনশারি্‌রল ওয়াসওয়াসিল খান্নাস। অর্থঃ- তুমি খান্নাসের কুমন্ত্রণা থেকে মুক্ত নাও।

মন্দ বা শয়তানি সত্ত্বা সম্পর্কে আপনাদের একটু বলিঃ- প্রচলিত বা জাগতিক শয়তান যেটা রাখা আছে সেটা হলো সৌদি আরবের মিনা পর্বতের গুহাতে তিনটি স্থাপত্য বানানো রয়েছে। এটার নাম ছোট শয়তান, আরেকটার নাম মেজ শয়তান এবং অপরটির নাম বড় শয়তান। তাহলে কোরানের সাথে সাংঘর্ষিক অর্থাৎ সেখানে কোরানের আয়াতের প্রতিফলন নেই। প্রকৃত ধর্মকে পেতে হলে এই দেহ ভান্ডে খুঁজতে হবে। তাহলে মক্কায় ছোট, বড়, মেজ শয়তানের স্থাপত্য রয়েছে কিন্তু কোরানুল মাজিদে ছোট, বড়, মেজ শয়তানের কথা তো বলা নেই। তাই এই শয়তান গুলো রুপক আকারে রাখা হয়েছে, তেমনি আমাদের বর্তমান ধর্মীয় ব্যবস্থাটাও রুপক আকারে চলমান রয়েছে। তাই রুপকতার চাকচিক্যের মোহতে পড়ে আমরা আসলকেই আর বুঝতে পারছিনা বা মানতে রাজি না। কোরানে শয়তানে চারটি দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, তাহলে সেগুলো কোথায় ?

প্রথমত:- আউযুবিল্লাহি মিনাস শয়তানির রাজিম। অর্থ বিতাড়িত বিদ্রোহ শয়তান হতে থেকে আশ্রয় প্রার্থণা করছি। আমি যদি সারাদিন আওউযু বিল্লাহি মিনাস শয়তানির রাজিম পড়ি, তবে কি শয়তান আমাকে ছেড়ে দেবে ? হয়ত সওয়াব পাওয়া যাবে কিন্তু আমাকে ছাড়বে না। মনে করুন আমি কোন এক স্থানে গমন করে বিপদ গ্রস্থ হয়ে পরেছি, আমি ঐ স্থানে থাকতে পারছি না। তাই আমি লুকানোর জন্য যদি কোন বাড়িতে গিয়ে বলি যে, বাবা আমাকে একটু আশ্রয় দাও, আমি বিপদগ্রস্থ হয়েছি একটু পরে চলে যাবো। তিনি যদি আমাকে আশ্রয় দেন তাহলেই তো আমি নিরাপদ বোধ করব। বুঝতে পারছেন তো আপনারা ? তাই ওলিদের রাস্তায় ওসিলাকে ধরতে বলা হয়েছে এটাই শয়তানের হাত থেকে বাঁচার প্রাথমিক ব্যবস্থা। চূড়ান্ত ফায়সালা তো আপনার কাছেই। কারণ পীর বা মোর্শেদ একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত থাকে। পীর আপনার রাস্তাটা বেঁধে দেয় আর এই বেঁধে দেওয়া পথ ধরেই আপনাকে অগ্রসর হয়ে পূর্ণতার শেষ প্রান্তে পৌঁছাতে হয়।

দ্বিতীয় হলো:- ফাসাজাদু ইল্লা ইবলিশ। অর্থ:- সবাই সেজ্‌দা দিল একমাত্র অহংকারী সেজ্‌দা দিল না। অর্থাৎ ইবলিশ সেজ্‌দা দেয় না। আদমকে (আঃ) সৃষ্টি করবার পর আল্লাহ্‌ বললেন তোমরা সবাই আদমকে সেজ্‌দা দাও। আযাজিল (আঃ) সেজ্‌দা দিয়ে দিলে শয়তানের উৎপত্তি হত না। এখানে রহস্য রয়েছে সেটা আপনাদের মাঝে একটু বলে রাখি:- আযাজিল (আঃ) আদম (আঃ) কে সেজ্‌দা দিলেন না কেন ? কারণ আযাজিল (আঃ) তো আল্লাহ্‌র হুকুমই মানতেন। যিনি ছয় লক্ষ বছর আল্লাহ্‌র ইবাদত বন্দেগী করতে করতে স্রষ্টার এত নিকটবর্তী হয়েছে যে, তাঁকে ফেরেশতা রাজ্যে ইমাম নিযুক্ত করা হয়েছিল। তিঁনি আল্লাহ্‌র আদেশ মানতেন। তাই আদমকে (আঃ) সেজদা দেওয়ার হুকুমও তো আল্লাহ্‌রই আদেশ। ফাসাজাদু ইল্লা ইবলিশ। অর্থ:- সবাই সেজ্‌দা দিল একমাত্র অহংকারী দিল না। এখানে একটি প্রশ্ন থেকে সেটা হলো, আযাজিল (আঃ) এর আগে তো কোন শয়তান বা অহংকারী ছিল না। তাহলে আযাজিল (আঃ) কে ধোঁকা বা কূমন্ত্রণা কে দিয়েছিল ? এটাই একটি রহস্য। তাই এই সেজ্‌দা না দেওয়ার জন্য বিভিন্ন ভাবে মানুষকে আটকানোর জন্য শয়তান বা মন্দ সত্ত্বা প্রচেষ্টা করে।

পীরের দরবারে যে ভক্তিটা রাখা হয় সেটা হলো তাজিম। প্রকৃত সেজ্‌দা আল্লাহ্‌র জন্যই। কিন্তু সেই প্রকৃত সেজ্‌দা দেওয়ার যোগ্য আমরা কি দিয়ে অর্জন করব ? যিনি কখনও ফুটবল খেলেন নি, তাকে বিশ্বকাপ ফুটবল মাঠে খেলায় নামিয়ে দিলে গোল করতে পারবেন ? প্রাকটিস থাকতে হবে, খেলতে

খেলতে পাঁকা খেলোয়ার হতে হবে। তাই যিনি অনুশীলন করেন নি তাকে কি দিয়ে শিখাবেন ? তাজিমটা শেখাটা হলো প্রাকটিস যা পীরের দরবারের একটি আকিদা। অহংকারের যে মূল বিশেষণ সেটাকে ধ্বংস করবার জন্য পীরের দরবারে এই তাজিম রাখা রয়েছে, আর এই আমলের দ্বারাই অহংবোধ দূরিভুত হয়। তাই তাজিমের যথার্থ গুরুত্ব রয়েছে। রাসুল (সঃ) বলেছেনঃ- যে মানুষের মধ্যে তিল পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। কারণ এই অহং বোধ থেকেই ইবলিশ সত্ত্বার উৎপত্তি হয়েছে। শয়তান সম্পর্কে তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছেঃ- আত্তালেবুদ্দুনিয়া মরদুদ। অর্থঃ- যে কেবল দুনিয়া চাইল বলে দাও সে মরদুদ নামে শয়তান। আমরা দুনিয়ার ভোগ-বিলাস, একটু ভাল থাকা, ভাল খাওয়া, ভাল পড়া এই বাসনা নিয়েই তো সাধারণত আমরা থাকি। তাই এই দুনিয়া চাইলে মরদুদ নামের শয়তান হয়। এই মরদুদটাও শয়তানের একটি নাম বা লকব।

শয়তান সম্পর্কে চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছেঃ- মিনশারি্রল ওয়াসওয়াসিল খান্নাস। অর্থঃ- তুমি খান্নাসের কুমন্ত্রণা থেকে মুক্ত নাও। অর্থাৎ- খান্নাস সমস্ত জায়গায় খুব সুক্ষ্ম রুপে বিরাজিত। আমার পীর ও মোর্শেদ কেবলা কাবা বলেন যেঃ- রক্তের সবচেয়ে সুক্ষ্ম কণিকা হলো অণুচক্রিকা, যা শক্তিশালী অনুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া দেখা যায় না। অণুচক্রিকার সাথেও খান্নাসি সত্ত্বা মিশে থাকে। এজন্য বাবা একটি বাণী বলে থাকেন যেঃ- খান্নাস হতে মুক্ত হওয়াই ধর্মের একমাত্র উপদেশ। খান্নাস ছাড়া বাকী শয়তানি সত্ত্বা গুলো স্বল্প সুক্ষ্মার মধ্যে বিরাজ করে। একটি মানুষের ব্লাড সারকোলেশন সমগ্র শরীরের পরিমন্ডল ব্যক্ত হয়ে থাকে। তাই এই খান্নাস মানুষের মধ্যে খুব সুক্ষ্ম রুপে বিরাজ করে। খান্নাস হতে যদি কেউ মুক্তি নিতে পারে বা চারটি মন্দ সত্ত্বা থেকে যদি কোন মানুষ তার দেহ ভান্ড থেকে দূরিভুত করতে পারে তাহলে তিঁনি ইনসানে কামেল হন। তখন সেই মানুষটা মোতমায়েন্না নফ্সের অধিকারী হয়। ইনসানে কামেল হলে তিঁনি আদমে রুপান্তর হয়ে যায়।

তাই ধর্মীয় দর্শনের সূচনায় বা সিঁড়ীতে থাকে একজন পীর বা মোর্শেদ। এজন্য পীর বা মোর্শেদের কাছে আত্মসমর্পণ করে প্রকৃত ধর্মের স্বাদ গ্রহন করতে হয়। এটাকে কেউ উছিলা ধরা, আহলে বায়াতে দাখিল হওয়া, মুরিদ হওয়া, যে ভাষাতেই আমরা বলি কেন, এখানেই মূল সিঁড়ীটা রাখা হয়েছে রাসুলের (সঃ) পরবর্তী ব্যবস্থায়। এই সিঁড়ীতে পাঁ দিলেই হবে না, এটাকে যথাযথ ভাবে ফলপ্রসূ করতে হবে। আপনাদের একটা কথা বার বার বলছি, সেটা হলোঃ- রাসুলের (সঃ) উম্মত হতে হলে রাসুলকে (সঃ) দেখতে হবে।

এই দর্শনবাদের জারিকৃত ব্যবস্থাই হলো মন্দ সত্ত্বাকে দূরিভুত করা। যিনি মন্দ সত্ত্বাকে দূরিভুত করতে পারেণ, তিঁনিই সফল মানুষ হন। শয়তানি বা মন্দ সত্ত্বা চলে গেলে নফ্স এবং আল্লাহ্ সত্ত্বা থাকে। তখন নফ্স এবং আল্লাহ্ সত্ত্বা মিলে একাকার হয়ে যায়। তখনই ওলিরা বলেন, যেমন মুনসুর হাল্লাজ বলেছিলেন:- আনাল হক। অর্থ আমিই সত্য। জমদগ্নি মুনি বলেছেন:- সোহ্হম সোহ্মি অর্থ:- তিঁনিই আমি, আমিই তিঁনি। শ্রী শ্রী চৈতন্যদেব বলেছেন:- তুঁই মুঁই, মুঁই তুঁই। বাবা বায়োজিদ বোস্তামী বলেছিলেন :- লাই সালাফি জুব্বাতি সেওয়া আল্লাহ্তাআলা। অর্থ:- আমার এই জুব্বার মধ্যে আল্লাহ্ ব্যতিত কিছুই নেই। অর্থাৎ এই সকল ওলি এবং আল্লাহ্র মধ্যে কোন পার্থক্য নেই বা বিভাজনকৃত ব্যবস্থা নেই।

তাই শয়তানি বা মন্দ সত্ত্বাকে দূরিভুত করতে হবে। মোহ মায়ার বন্ধনে থাকা অবস্থায় আমরা যতই সত্য শুনি বা পরিপূর্ণতার আহ্ববান শুনি, কিন্তু এই আহ্বানের কোন কার্যকারিতা বা ফলপ্রসূ হয় না। এই মোহ মায়ার জন্য মানুষ পীর বা মোর্শেদ প্রদত্ত ব্যবস্থায় ধাবিত হতে চায় না। তাই মোর্শেদ প্রদত্ত ব্যবস্থায় ধাবিত হওয়ার পর ইনসানে কামেল হলেই আদম লকবের পরিপূর্ণতা ফলপ্রসূ হয়। ধর্মের প্রকৃত কার্য হলো জানা, বোঝা প্র্যাকটিক্যাল উপলব্ধির মাধ্যমে পূর্ণতা অর্জন করা। প্রতিটি আমলে যথার্থতা কার্যকারিতা ফলানোই হলো ধর্মের বিধান। শুধু করে গেলাম, সেটার কোন উপলব্ধি না পেলে পূর্ণতা ফলবে না। জাগতিক ভাবে কোন কর্মস্থলে আপনি যদি এক দিনও কর্ম করে থাকেন, তাহলে সে দিনের মুজুরীটাও আপনি নিয়ে নেন। আর স্রষ্টার প্রকৃত বিধানের আমলগুলো আপনি সারা জীবন ফ্রি করে যাবেন, সেটা শুধু আল্লাহ্ই জানবে, আমি জানতে পারবো না, এমন কর্ম বোকার স্বর্গে বাস করা ছাড়া আর কিছুই নয়। অর্থাৎ আপনি যে কর্মটুকুই করেন সেটার পূর্ণতাকে তো আপনার বুঝতে হবে। আজকে দুনিয়ার পরীক্ষার হলে যদি একটি প্রশ্নের উত্তরও লিখি, আমার সেই উত্তরের নিরুপণ করে আমাকে কত মার্কস দেবেন ? সেই রেজাল্টাও আমাকে দিয়ে দেয়। তাহলে জাগতিক ভাবে যদি এরকম করে নিরীক্ষা করে রেজাল্ট দেওয়া হয় আর ধর্মের বিষয়ে আমরা উদাসীন বা বাকীর লোভে থাকি। অর্থাৎ আল্লাহ্র হুকুম পালন করলাম, আল্লাহই জানবে। এমন বোকার স্বর্গে বাস না করে প্রকৃত ধর্ম সম্পর্কে জানবেন, বুঝবেন এবং সেটা মানার জন্য চেষ্টা করবেন।

আল্লাহ্পাক সর্ব প্রথম সৃষ্টি করেছেন নূরে মোহাম্মদী। হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদিসঃ- রাসুল (সঃ) এরশাদ করেন যে, যখন আল্লাহ্ ছাড়া কিছুই ছিল না, তখন আল্লাহ্পাক তাঁর নিজ নূর হতে তাঁর হাবিব (সঃ) এর নূর পৃথক করেন। অতঃপর প্রিয় নূরে মোহাম্মদী (সঃ) এর নূর চার ভাগে ভাগ করে প্রথম ভাগে কলম, দ্বিতীয় ভাগে লওহে মাহফুজ, তৃতীয় ভাগে আরশ সৃষ্টি করেন। অবশিষ্ট এক ভাগ দিয়ে তা আবার চার ভাগ করেন। প্রথম ভাগ দিয়ে আরশ বহনকারী ফেরেসতা, দ্বিতীয় ভাগ দিয়ে কুরসি বহনকারী ফেরেসতা, তৃতীয় ভাগ দিয়ে অন্যান্য দায়িত্বরত ফেরেসতাদের সৃষ্টি করেন। দ্বিতীয় চার ভাগের অবশিষ্ট এক ভাগকে আবার চারটি ভাগে বিভক্ত করে প্রথম ভাগ দিয়ে আসমান, দ্বিতীয় ভাগ দিয়ে জমিন (দুনিয়া) এবং তৃতীয় ভাগ দিয়ে বেহেস্ত ও দোযখ সৃষ্টি করেন। অবশিষ্ট এক ভাগকে আবার চারটি ভাগে বিভক্ত করে এর প্রথম ভাগ দিয়ে মুমিনদের নয়নের (দৃষ্টি শক্তি) নূর, দ্বিতীয় ভাগ দিয়ে আল্লাহ্র মারিফাত (কল্বের নূর) এবং তৃতীয় ভাগ দ্বারা কলেমা তাওহীদ সৃষ্টি করেন এবং অবশিষ্ট এক ভাগ দিয়ে অন্যান্য জগত সৃষ্টি করেন (হাদিসে মাওয়াহেব)।

উক্ত হাদিসখানা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সৃষ্টির মূল হলো নূরে মোহাম্মদী বা নবী করিম (সঃ) এর নূর। পবিত্র কালামপাকে সুরা ফাতাহ এর ৮ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ্পাক বলেছেনঃ- ইন্নাআরসালনাকা শাহিদাওঁ ওয়া মুবাশ্বিরাওঁ ওয়া নাজিরা। অর্থঃ- নিশ্চয় আমি (হাবিব সঃ) হাজির নাজির বা প্রত্যক্ষকারী সাক্ষী; সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী নবী-রাসুল হিসাবে প্রেরন করেছি। তাই তিঁনি আমাদের সকল কিছুর প্রত্যক্ষকারী এবং শেষতম সুপারিশকারী, সুতরাং নবী-নূর থেকে সকল কিছুর প্রত্যাবর্তন।

সুরা আল-বাকারার ৩০ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ্পাক বলেছেনঃ- আমি আদমকে পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি নিযুক্ত করিব। কোরানুল মাজিদের দশটি সুরায় পঞ্চাশটির মত আয়াতে বাবা আদম (আঃ) এর নাম উল্লেখ রয়েছে। সুরা আল-ইমরানে, সুরা আল-আরাফ, সুরা বনী ইসরাঈল, সুরা আল-কাহফ, সুরা ত্বোয়া-হা তাঁর নামের গুণাবলীর আলোচনা রয়েছে। সুরা আল-হিজর, সুরা ছোয়াদে শুধু গুণাবলী এবং সুরা আল-ইমরান, সুরা মায়িদা, সুরা ইয়াসীনে আনুষ্ঠানিক রুপে শুধু নামের উল্লেখ রয়েছে।

কালামপাকে আরও উল্লেখ রয়েছে সৃষ্টির আদিতে প্রথম থেকে পঞ্চম দিসব পর্যন্ত সবকিছু সৃষ্টি করেন এবং ৬ষ্ঠ দিবসে মানুষ সৃষ্টি করেন। পূর্বের সৃষ্টিতে পঞ্চম দিবস পর্যন্ত কুন-ফায়াকুন দ্বারা আর মানুষের সৃষ্টি হলো তাঁর (আল্লাহ্‌র) হস্ত দ্বারা। পবিত্র কালামপাকের নির্ধারিত আয়াতগুলি অনুধাবন করার জন্য নিম্নে উপস্থাপন করা হইল।

২ নাম্বার সুরা আল-বাকারা = ৩০,৩৪ নাম্বার আয়াত।
৭ নাম্বার সুরা আল-আরাফ = ১১ নাম্বার আয়াত।
১৫ নাম্বার সুরা আল-হিজর = ২৯ নাম্বার আয়াত।
১৭ নাম্বার সুরা বণী ইসরাঈল = ৬১ নাম্বার আয়াত।
১৮ নাম্বার সুরা আল-কাহাফ = ৫০ নাম্বার আয়াত।
২০ নাম্বার সুরা ত্বোয়া-হা = ১১৬ নাম্বার আয়াত।
২১ নাম্বার সুরা আল-আম্বিয়া = ৯১ নাম্বার আয়াত।
৩৩ নাম্বার সুরা আল-আহ্‌যাব = ৭২ নাম্বার আয়াত।
৩৮ নাম্বার সুরা ছোয়াদ = ৭২, ৭৫ নাম্বার আয়াত।
৫৫ নাম্বার সুরা আর-রহ্‌মান = ৪ নাম্বার আয়াত।
৩৩ নাম্বার সুরা আল-আহ্‌যাব = ৭২ নাম্বার আয়াত।
৮২ নাম্বার সুরা আল-ইনফিতর = ৮ নাম্বার আয়াত।
৯৫ নাম্বার সুরা ত্বীন = ৪ নাম্বার আয়াত।

বাণী চিরন্তনী

“আস্তাগফিরুল্লাহ্‌ বলতে গেলে ৬টি ভিত্তির প্রয়োজন”

(১) অতীত বিষয়ে অনুতাপ (২) সে দিকে আর প্রত্যাবর্তন না করার বিষয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা (৩) মানুষের সকল অধিকার পূরণ করা যাতে আল্লাহ্‌র কাছে যেতে পারে কোন জবাবদিহি না করতে হয় (৪) সকল দায়িত্ব পালন করা যাতে ন্যায় প্রতিষ্ঠা হয় (৫) হারাম রোজগার দ্বারা যে মাংস শরীরে হয়েছে, অনুতাপে তা গলিয়ে দেওয়া যেন চামড়া হাড়ের সঙ্গে লেগে যায় এবং আবার নতুন মাংস গজায় (৬) আল্লাহ্‌র অনুগত্যের বেদনা সহ করার জন্য দেহকে গড়ে তোলা। এমন অবস্থায় আস্তাগফিরুল্লাহ্‌ বলতে পার।

মওলা আলী (আঃ)

❊ "প্রেম হাসায়, প্রেম কাঁদায়, প্রেম স্বর্গীয়
প্রেম মূলকে পাইয়ে দেয়"

❊ "একেরই প্রকাশ, একেরই বিকাশ, একেরই ছুটে চলা
বহুগুণের বিকাশ, বহুগুণের সমষ্টির সূচনা গুরু"

❊ "সত্যবাদীতা এবং পবিত্রটা লাভ হলে
স্বর্গীয় সুখের সত্ত্বাতে উপস্থিত হয়"

❊ "জ্ঞাণীদের নিরবতা মঙ্গল নয়
বরং মঙ্গল হলো মূল বিষয় উপস্থাপন করা"

❊ "মানুষ যখন উদারতার কথা ভূলে যাবে
তখন মন্দ লোক ধার্মিকদের হেয় পতিপন্ন করবে,
অসহায়দের সকল কিছু কিনে নিয়ে
তারা উপরের সিঁড়ীতে অবস্থান করবে
যা লোক দেখানো"

❊ "সাধকদের নিয়ে হাসি তামাশায় লিপ্ত হলে
তার প্রজ্ঞা কমে যাবে,
ধীরে ধীরে যাতনায় ভূগতে থাকবে
এমন কর্ম থেকে দূরে থাকাই শ্রেয়"

শৃঙ্খলার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে শৃঙ্খল হতে মুক্ত হওয়া গুরু বাদের একমাত্র কাজ

ইঙ্গিঃ বাবা দেলোয়ার হোসেন বা–গোলামে জাহাঙ্গীর আল্ সুরেশ্বরী।

বি:দ্রঃ বিবৃতিতে সংকলিত কোন তথ্য পাওয়া গেলে তা এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করার সবিনয় অনুরোধ রইল।

মুদ্রণ জনিত ত্রুটির জন্য মার্জনা প্রত্যাশা রইল।

সেই সত্ত্বা – ১১২

বইটি পাঠকদের হাতে তুলে ধরতে যারা সহযোগীতা করেছেন-

(১) মোঃ হাসনাত বিশ্বাস- কায়েমকোলা, দোগাছী, পাবনা।
(২) মোঃ আমজাদ হোসেন- বোবরাখালী, দোগাছী, পাবনা।
(৩) মোছাঃ সেলিনা বিশ্বাস- কুলনিয়া, দোগাছী, পাবনা।
(৪) মোছাঃ হাসিনা বিশ্বাস- কায়েমকোলা, দোগাছী, পাবনা।
(৫) মোছাঃ শারমিন বিশ্বাস- কায়েমকোলা, দোগাছী, পাবনা।
(৬) মোছাঃ কল্পনা বিশ্বাস- কায়েমকোলা, দোগাছী, পাবনা।
(৭) মোছাঃ জবা খাতুন- পাবনা।
(৮) মোছাঃ তানজিলা খাতুন- পাবনা।
(৯) মোঃ জাহাঙ্গীর বিশ্বাস- দোগাছী, পাবনা।
(১০) হাফেজ মোঃ রবিউল ইসলাম-বোবরাখালী, দোগাছী, পাবনা।
(১১) মোঃ শাহজাহান- কুড়িপাড়া, সুজানগর, পাবনা।
(১২) মোঃ হাসিবুজ্জামান (অনিক), খয়েরসূতি, দোগাছী, পাবনা।
(১৩) মোঃ আনিছুজ্জামান (আনিছ), খয়েরসূতি, দোগাছী, পাবনা।
(১৪) মোঃ হাসানুজ্জামান (লিপটন), খয়েরসূতি, দোগাছী, পাবনা।
(১৫) মোঃ আকতারুজ্জামান (সুমন), খয়েরসূতি, দোগাছী, পাবনা।
(১৬) মোঃ আনিস- মুনিবপুর, দোগাছী, পাবনা।
(১৭) মোঃ হোসেন আলী বিশ্বাস- কুলনিয়া, দোগাছী, পাবনা।
(১৮) মোছাঃ ফাতেমা বিনতে সরকার-রাজাপুর, পাবনা।
(১৯) মোঃ সুলতান মাহমুদ- শাহ্জাদপুর, সিরাজগঞ্জ।
(২০) মোঃ রবিউল ইসলাম (রবী)-চিথলিয়া, দোগাছী, পাবনা।
(২১) মোঃ আরাফাত হোসেন- রাজশাহী।
(২২) মোঃ বাবু বিশ্বাস- কুলনিয়া, দোগাছী, পাবনা।
(২৩) মোঃ হান্নান শেখ- চকদুবলিয়া, দোগাছী, পাবনা।
(২৪) মোঃ জুয়েল- চরবলরামপুর, দোগাছী, পাবনা।
(২৫) মোঃ মজিদ- মুনিবপুর, দোগাছী, পাবনা।
(২৬) মোঃ ইবায়দুল দর্জি- চকদুবলিয়া, দোগাছী, পাবনা।
(২৭) মোঃ আব্দুস সালাম- বোবরাখালী, দোগাছী, পাবনা।
(২৮) মোঃ তুষার বিশ্বাস- কুলনিয়া, দোগাছী, পাবনা।
(২৯) মোঃ জহুরুল ইসলাম- কুলনিয়া, দোগাছী, পাবনা।
(৩০) মোঃ মান্নান- পিঁপড়িয়া, দোগাছী, পাবনা।
(৩১) মোঃ ফিরোজ- মনিবপুর, দোগাছী, পাবনা।
(৩২) মোঃ শরীফ- মনিবপুর, দোগাছী, পাবনা।
(৩৩) মোঃ ওহিদুল- কায়েমকোলা, দোগাছী, পাবনা।
(৩৪) মোঃ বাবু মৃধা- বেড়াদুলিয়া, সুজানগর, পাবনা।
(৩৫) মোঃ রকিবুল হাসান- বনগ্রাম, আতাইকুলা, পাবনা।
(৩৬) মোঃ সিহাব শেখ- ফুলালদুলিয়া, সুজানগর, পাবনা।
(৩৭) মোঃ বাবুল শেখ- বেড়াদুলিয়া, সুজানগর, পাবনা।
(৩৮) মোঃ সাদ্দাম মিঞা- ফুলালদুলিয়া, সুজানগর, পাবনা।
(৩৯) মোঃ সুজন সম্রাট- চরদুলকদিয়া, পাংশা, রাজবাড়ী।
(৪০) মোছাঃ রিক্তা সুজন- চরদুলকদিয়া, পাংশা, রাজবাড়ী।
(৪১) মোঃ জাহিদুল ইসলাম- চরবলরামপুর, দোগাছী, পাবনা।
(৪২) সুজন- শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ।